বামপন্থার সঙ্কট, ফ্যাসিবাদের বিপদ ও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রসঙ্গে

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

বামপন্থার সঙ্কট, ফ্যাসিবাদের বিপদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রসঙ্গে

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, ২০১৫

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৬ টাকা

প্রকাশকের কথা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৯তম স্মরণদিবস ৫ আগস্ট, ২০১৪ কলকাতায় রানি রাসমনি অ্যাভেনিউতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের পর সভা চলাকালীনও দফায় দফায় বৃষ্টি হয়। এর মধ্যেই অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার সাথে হাজার হাজার মানুষ সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের দীর্ঘ আলোচনা শোনেন। কমরেড প্রভাস ঘোষের মূল্যবান এই ভাষণটি 'গণদাবী'র ৬৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সংখ্যায়। পাঠকদের চাহিদার কারণে ভাষণটি সেপ্টেম্বর মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশের পূর্বে কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছুটা পরিমার্জন করে দিয়েছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং পাঠকদের মধ্যে বইটির চাহিদা লক্ষ করে আমরা তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করলাম।

জানুয়ারি, ২০১৫ **মানিক মুখার্জী**

বামপন্থার সঙ্কট, ফ্যাসিবাদের বিপদ ও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রসঙ্গে

৫ আগস্ট দিনটিতে আমরা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের শিক্ষক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্যসাধারণ বৈপ্লবিক জীবন সংগ্রাম এবং তাঁর অমূল্য শিক্ষাবলী স্মরণ করি। এ দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়ায় আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করে যে মার্কসবাদী বিচারধারা তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন — তার ভিত্তিতেই সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করি। এইভাবে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর শোককে বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত করেই আগামী দিনের কাজে ব্রতী হই।

আজকের সভায় আলোচনার জন্য বিভিন্ন কমরেড এবং সমর্থকদের থেকে বহু প্রশ্ন আমার কাছে দেওয়া হয়েছে। আমি সবগুলি না হলেও, যতটা সম্ভব এবং যেগুলি প্রয়োজনীয় তার ওপর আলোচনা করার চেষ্টা করব। নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী, নির্বাচনের ফলাফল, বিজেপির পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসা, ফ্যাসিবাদের বিপদ, রাজ্যে সিপিএমের পরাজয়, বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা এবং আগামী দিনের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলো আমরা কী ভাবে গড়ে তুলতে পারি, মূলত এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব। বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। বিষয়বস্তু যতটা, তাতে খানিকটা সময়ও লাগবে, এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের ও অন্যান্যদের কিছু বক্তব্য যা প্রাসঙ্গিক, আপনাদের আমি পড়েও শোনাতে চাই।

আমি প্রথমেই বলতে চাই, অন্যান্য দলগুলি যে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্বাচনে নামে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত শ্রমিকশ্রেণির দল হিসাবে আমাদের দলের দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুদিন আগেই মহান লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া পার্লামেন্ট নির্বাচন হচ্ছে, কয়েক বছর অন্তর কোন্ দল বুর্জোয়া শ্রেণির হয়ে শাসন এবং অত্যাচার চালাবে তা স্থির করা। তা সত্ত্বেও কমরেড লেনিন বলেছিলেন, যতদিন পার্লামেন্ট সম্পর্কে মানুষের মোহ আছে, যতক্ষণ মানুষ পার্লামেন্টের অকার্যকারিতা অনুভব না করছে এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ পার্লামেন্টে বুর্জোয়াদের শ্রেণিচরিত্র খুলে দেওয়ার জন্য বিপ্লবীদের নির্বাচনে যেতে হয়। লেনিন নিজেও বিপ্লব পূর্ববর্তী রাশিয়ায় নির্বাচনে কয়েকবার অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, আমরা বিপ্লবীরাও কখনও কখনও

অনন্যোপায় হয়ে নির্বাচনে নামি—কথাটা লক্ষ করুন, তিনি বলেছেন, অনন্যোপায় হয়ে নির্বাচনে নামি, মানে বাধ্য হয়ে নির্বাচনে নামি। কারণ, বিপ্লবী দলের প্রধান কাজ হল, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম সংগঠিত করা, গণআন্দোলন সংগঠিত করা, মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় শিক্ষিত-অনুপ্রাণিত এবং সংঘবদ্ধ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন নির্বাচন আসে এবং জনগণ অংশ নেয়, তখন বাধ্য হয়ে আমরা নির্বাচনে নামি। তিনি বলছেন, যখন আমরা নির্বাচনে নামি, তখনও আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে— জনগণকে নির্বাচন সম্পর্কে মোহমুক্ত করে বিপ্লবী চেতনায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা, অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির চরিত্র উদঘাটন করা এবং জনগণকে সংঘবদ্ধ করা। এতে যদি সিট জিততে পারি ভালো, যদি সিট না-ও জিততে পারি, তাতেও এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা নির্বাচনে লড়ি। অন্যান্য বুর্জোয়া দলের বা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের মতো যেভাবেই হোক সিট জিততে হবে, নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জিততে হবে, এটা আমাদের লক্ষ্য নয় — এই কথা তিনি বলেছিলেন।

বুর্জোয়া প্রচারে অসংগঠিত জনগণ উলুখড়ের মতো উড়ে যায়

আর একটি দিকও তিনি বলেছিলেন, যেটা আমি পড়ে শোনাতে চাই। আমাদের দেশের নির্বাচন কিভাবে হয় বুঝতে হলে এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ১৯৬৯ সালেই বলেছিলেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিকস। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও শ্রেণি সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে, শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা, বিপুল টাকা ঢেলে এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে দেয়, জনগণ উলুখড়ের মতো সেই দিকেই ভেসে যায়।" (শিবদাস ঘোষ রচনাবলী, ৩য় খন্ড) এই কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, সব পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেই।

১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত নির্বাচন হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তার পছন্দমতো দলকে বাছাই করে কাউকে সরকারি পক্ষে, কাউকে বিরোধী পক্ষে বসিয়েছে। এজন্য নির্বাচনে পছন্দের দলের পক্ষে বুর্জোয়ারা প্রচুর টাকা ঢালে এবং প্রচারমাধ্যম — কমরেড ঘোষ যখন বলেছিলেন, তখন শুধু খবরের কাগজ ছিল, এখন টিভি একটা বিরাট মাধ্যম হিসাবে যুক্ত হয়েছে — এই সমস্ত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে, বুর্জোয়া শ্রেণি যাকে চায়, তাকে জনগণের সামনে হাজির করে। জনগণ তথা শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের মধ্যে যেহেতু বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা নেই, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নেই, ফলে কোন্ দল কোন্ শ্রেণির স্বার্থে চলে, তারা বুঝতে পারে না। এই রাজনৈতিক চেতনা না থাকার ফলে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে তারা সংঘবদ্ধ থাকে না, বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এ অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণি যে হাওয়া

তোলে, সে হাওয়ায় জনগণ উলুখড়ের মতো উড়ে যায়। আজ পর্যন্ত দেশে যত নির্বাচন হয়েছে, প্রত্যেকটা নির্বাচনেই এ জিনিস হয়েছে। এবারকার নির্বাচনেও তাই ঘটেছে। গত দশ বছর কংগ্রেস বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদে ক্ষমতায় ছিল। এবার বুর্জোয়া শ্রেণি বুঝল, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বা কর্পোরেট সেক্টর বুঝল, কংগ্রেস তাদের হয়ে কাজ করে এত আনপপুলার হয়েছে যে, এখন জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের ছিল কোয়ালিশন সরকার। কংগ্রেস বুর্জোয়া শ্রেণির হয়েই কাজ করেছে, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণির হয়ে তথাকথিত যে সংস্কার বা লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশনের বিভিন্ন যে স্কিম আরও ব্যাপকভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কার্যকর করা দরকার, আঞ্চলিক দলগুলির বাধাদানের ফলে কংগ্রেস সবটা করতে পারে নি। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণি বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদিকে ভারতবর্ষের ত্রাতা হিসাবে হাজির করে দিল এবং নির্বাচনের যে হাওয়া তুলে দিল সে হাওয়ায় গোটা ভারতবর্ষে কী ফলাফল ঘটেছে আপনারা দেখেছেন। নির্বাচনের আগে বিজেপি বলেছিল তারা 'সুদিন' নিয়ে আসবে। কী সুদিন আনছে, তা আপনারা প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ভোটের আগে বলেছিল 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসবে, ভোট শেষ হওয়ার পর গদিতে বসেই বলল এখন কিছুদিন তেতো বড়ি দেশের মানুষকে খাওয়াবেন জনগণের স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্য। একটার পর একটা তেতো বড়ি আসছে এবং তার ধাক্কায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। অন্য দিকে বুর্জোয়ারা, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা উল্লসিত হচ্ছে, বিজেপির জন্য যে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা তারা ইনভেস্ট করেছে, সেটা সুদে-আসলে কড়ায়-গন্ডায় উসুল করতে পারবে। এ ছাড়াও বিজেপি-আর এস এসের অন্য গুরুতর বিপদ সম্পর্কে আমি পরে বলব।

সিপিএম-র শক্তির উৎস সরকার, বামপন্থা নয়

আগে আমি আর একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই, যে বিষয়টা নিয়ে মানুষের মধ্যে, বিশেষত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্ন, একটা দুশ্চিন্তা ধাক্কা দিচ্ছে। মূলত সিপিএমের নির্বাচনী পরাজয়কে ভিত্তি করেই বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি প্রথমেই বলতে চাই, বামপন্থা আর মার্কসবাদ এক নয়। যারা যথার্থ মার্কসবাদী তারা মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে, মার্কসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করে যথার্থ সর্বহারা বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করে, সঠিক বিপ্লবী সংস্কৃতি নির্ধারণ করে, এবং এসবের ভিত্তিতে একটা যথার্থ সর্বহারা বিপ্লবী দল গড়ে তোলে— যেমন আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে উঠেছে। আমরা বামপন্থী। আবার বামপন্থী মাত্রেই মার্কসবাদী নয়। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিপ্লববাদ ও বামপন্থা সমার্থক ছিল। তখন অবশ্য যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল এ দেশে ছিল না। গান্ধিবাদীরা, আপসমুখীরা, যারা ছিল বিপ্লববিরোধী তাদের বলা হত দক্ষিণপন্থী। আর যাঁরা

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেআপসহীন লড়াই করতেন, সশস্ত্র বিপ্লববাদের পক্ষে ছিলেন, সুভাষ বসু যার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরা ছিলেন বামপন্থী। আজকের দিনে যথার্থ মার্কসবাদী নয় কিন্তু মার্কসবাদী বলে দাবি করে, মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি নেই, বিপ্লবের যথার্থ পথ জানা নেই, কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে আকাঙ্খা ব্যক্ত করে, এমন দল যারা শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে লড়াই করছে বলে দাবি করে, তারাও বামপন্থী আন্দোলনের শরিক। এইভাবে যারা দল গড়ে তোলে তারাও বামপন্থী এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই একদিন ঐক্যবদ্ধ সিপিআই এবং পরে সিপিএম যখন গড়ে ওঠে তাদেরকে আমরা বামপন্থী হিসাবে দেখেছি।

একটা কথা এখানে বলতে চাই। অনেকে ভাবছেন ও বলছেনও যে, ভোটে পরপর সিপিএমের বিপর্যয়ের ফলেই যেন বামপন্থা দুর্বল হয়ে গেছে। আমি বলি, ধরে নিন এখনও পশ্চিমবাংলায় সিপিএমের সরকার আছে, ধরে নিন এবারকার নির্বাচনে সিপিএম বিরাট ভোটে জয়লাভ করেছে। তাহলেও কি বামপন্থা শক্তিশালী হত? ৩৪ বছর তো তারা ছিল ক্ষমতায়। তাহলে ৩৪ বছরে বামপন্থার অনেক শক্তি ছিল বলতে হয়। তা হলে হঠাৎ করে সরকার পড়ে যাওয়ার পর তাদের শক্তি এরকম হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কেন? তা হলে তাদের শক্তির উৎস কী ছিল? যথার্থ একটা বামপন্থী আদর্শ, বামপন্থী সংগ্রাম, বামপন্থী নীতি, বামপন্থী সংস্কৃতির ভিত্তিতে কি সেই শক্তি গড়ে উঠেছিল? নাকি ৩৪ বছর তাদের এই শক্তির উৎস ছিল সরকার, পুলিস-প্রশাসনের ব্যাকিং আর সরকার থাকার ফলে ক্রিমিনালবাহিনীর ব্যাকিং, প্রমোটার-কন্ট্রাক্টর-ব্যবসাদার-পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ? এটাই কি যথার্থ বামপন্থা? তাহলে বলতে হয়, তাদের বামপন্থা ছিল সরকার-নির্ভর বামপন্থা। সরকার থাকলে তাদের বামপন্থার শক্তি থাকে, সরকার না থাকলে তাদের বামপন্থার শক্তি থাকে না। এটা কখনই যথার্থ বামপন্থা হতে পারে না। এই কথাটাই আমি প্রথমে বলতে চাই।

সিপিএম বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে

যথার্থ বামপন্থা একদিন ছিল পশ্চিমবাংলায়, স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বামপন্থা ছিল সুভাষ বসুর নেতৃত্বকে ভিত্তি করে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলা ছিল নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল। তখন বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল — এঁদের ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক মনন গড়ে উঠেছিল, অন্য দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষ বসু, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা — এঁদের ভিত্তি করে বিপ্লববাদ গড়ে উঠেছিল। এই বামপন্থাকে ভিত্তি করে এখানে প্রগতিশীল মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল সোভিয়েত বিপ্লব, চীন বিপ্লব, কমিউনিজমের জোয়ার, যা সৃষ্টি হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী সামরিক শক্তির পরাজয়ের ফলে। এই সব নিয়েই সেদিন অবিভক্ত

সিপিআই প্রবল প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল, সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনও তারা পেয়েছিল। সেই সময়ে — এখনকার বয়সে ছোটরা জানেন না — সিপিআই-এর গর্ভে ছিল সিপিএম, তারা সরকার করতে পারবে, তখন ভাবতেও পারেনি। ১৯৫২ সালের প্রথন নির্বাচনে এই কলকাতা শহরে অধিকাংশ পার্লামেন্ট ও অ্যাসেম্বলি সিট পেয়েছিল সিপিআই, কংগ্রেস নয়। কলকাতাকে বলা হত লাল শহর। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষক-ডাক্তার-উকিল-ছাত্র-যুবক বামপন্থীদের ভোট দিত, গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ভোট পেত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল বামপন্থার প্রতি প্রবল আবেগ। এরপর ১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, '৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলন, '৫৬ সালে সরকার বাংলা-বিহার এক রাজ্য করতে গিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন— এই পুরো পর্বটাই হচ্ছে বামপন্থী আন্দোলনের গৌরবে উজ্জ্বল। আমাদের দল তখন আজকের তুলনায় অনেক ছোট ছিল। আমরা এই আন্দোলনগুলিতে ছিলাম বিপ্লবী লাইন নিয়ে। সিপিআই-এর ছিল সংস্কারবাদী লাইন। তখন ছিল বামপন্থার মিলিট্যান্ট স্ট্রাগলের যুগ। স্বদেশি আন্দোলনে যেমন মানুষ স্বদেশি শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করত, সবটা সেরকম না হলেও বামপন্থী শুনলেও মানুষ শ্রদ্ধা করত, বিশ্বাস করত, ভাবত এরা সৎ, এরা পুলিসের মার খায়, জেলে যায়, এরা গুলির সামনে লড়ে, লাল ঝান্ডা গরিবের ঝান্ডা। সমাজে এই মানসিকতা ছিল।

১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে সি পিএম তৈরি হয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সিপিএম সিপিআই আলাদা দুটি ফ্রন্ট করেছিল। আমরা আর সিপিএম ও অন্যান্যরা মিলে একটা ফ্রন্ট, সিপিআই-বাংলা কংগ্রেস আরও কিছু দল মিলে আলাদা ফ্রন্ট হয়েছিল। ভোট ভাগ হওয়া সত্ত্বেও দুটি ফ্রণ্ট মিলে কংগ্রেসকে পরাস্ত করল। পাবলিকের চাপে দুই ফ্রণ্ট মিলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। প্রথমটা কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক গণআন্দোলনের শক্তিতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। এই দুটি সরকারে আমরা ছিলাম। আজ সিপিএমের যে পরিণতি দেখছেন, সেদিন এতটা না হলেও মূল রাজনীতি ও আচরণ নিয়ে সে সময় আমাদের সাথে সিপিএমের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, সেটা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সিপিএমের কোনও বন্ধু যদি এখানে থাকেন বিচার করে দেখবেন। আমরা সেদিন বলেছিলাম, সরকারে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে কী করব? একটা বুর্জোয়া দলের মতো সরকার চালাব? পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থে কাজ করব? শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করব? গণআন্দোলন দমনে আইন-শৃঙ্খলার নামে পুলিস লাঠি চালাবে, গুলি চালাবে? লেনিনের সময় এই ইসু আসেনি, ফলে তিনি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা কীভাবে সরকার চালাবে এই নিয়ে গাইড লাইন দিয়ে যেতে পারেননি, যেটা দিয়েছিলেন তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ। ফলে তাঁর শিক্ষায় আমরা

বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিকে যেমন যতটুকু তার হাতে টাকা থাকবে, সেই টাকায় সবচেয়ে বেশি কাজ করবে গরিব মানুষের জন্য, দুর্নীতিমুক্ত সরকার করবে; প্রশাসন যন্ত্রে, পুলিসের মধ্যে কোনও রকম দুর্নীতির অস্তিত্ব রাখতে দেবে না, কঠোরভাবে তা দমন করবে। অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনকে উৎসাহিত করবে, পুলিসকে তা দমন করতে দেবে না। ফলে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না। এই হবে সরকার পরিচালনায় যথার্থ বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি। সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস মানতে প্রস্তুত ছিল না। আমরা বললাম, তা হলে আমরা সরকারে থাকব না, বাইরে থেকে সমর্থন করব। তখন তারা বাধ্য হয়ে মানল। কারণ তখন সিপিএমের অবস্থা আজকের মতো নয়। সিপিএমের নিচুতলায় অনেক সৎ নেতা-কর্মী ছিলেন। কাগজে এ খবর বেরিয়ে গেলে নেতারা বিপদে পড়তেন। তাঁরা খাতায়-কলমে লিখলেন যে মানব, কিন্তু বাস্তবে কার্যকরী হতে দেননি। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে আমাদের দলের হাতে শ্রম দপ্তর থাকার ফলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল। তাই টাটা-বিড়লার চাপে আমাদের দলকে '৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তর থেকে সরিয়ে দিল। '৭৭ সালে রেডিও ভাষণে জ্যোতিবাবু ঘোষণা করলেন যে, এবার আর ভয় নেই, পশ্চিমবাংলায় আর আন্দোলন বা অশান্তি হবে না, কারণ এস ইউ সি আই আমাদের সাথে নেই। এভাবে পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করলেন। মূলত এই জন্যই আগেভাগে তাঁরা আমাদের সাথে ঐক্য ভেঙে দিয়েছিলেন। এরপর '৭৭ সাল থেকে তারা যে সরকার চালিয়েছে সেই সরকারের সাথে একটা বুর্জোয়া সরকারের কোনও পার্থক্য ছিল না। তারা শ্রমিক-কৃষকদের উপর লাঠি-গুলি চালিয়েছে। তারা শিল্পে শান্তির নামে কলকারখানায় ধর্মঘট কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা তাদের ট্রেড ইউনিয়নকে দিয়ে মালিকের সাথে সমঝোতা করা, শ্রেণিসংগ্রামের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে আত্মসমর্পণ করা শিখিয়েছে। তারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষক আন্দোলনে গণহত্যা, গণধর্ষণ করিয়েছে। তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে চূড়ান্ত সুবিধাবাদের চর্চা করিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের গলা টিপে মেরে দিয়েছে। এইভাবে তারা গণআন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রামকে ৩৪ বছর ধরে ধ্বংস করে দিয়েছে। এভাবে বামপন্থাকেও কলঙ্কিত করেছে।

বামপন্থার সর্বনাশ করেছে সিপিএম, দক্ষিণপন্থীরা নয়

অন্য দিকে তাদের দলের মধ্যে — মার্কসবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম— বামপন্থী রাজনীতি বা বামপন্থী আদর্শেরও কোনও চর্চা ছিল না, শুধু স্লোগানটা ছিল। আর বাস্তবে কী শাসন তারা চালিয়েছে সেটা আপনারা জানেন। সমস্ত জায়গায় পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে, বিশাল ক্রিমিনাল বাহিনী গড়ে তুলেছে। দলের নেতা-মন্ত্রীরা প্রোমোটারি, কন্ট্রাক্টরি করেছেন বা বেনামে করিয়েছেন।

সিপিএমের এক প্রবীণ সৎ নেতা ও মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী খেপে গিয়ে বললেন, এটা প্রোমোটার-কন্ট্রাক্টরদের রাজ। জ্যোতিবাবু তাকে বললেন, তা হলে পদত্যাগ করুন। তারপর অবশ্য আর তাঁকে ভোটে দাঁড়াতে দিলেন না। প্রোমোটারি, কন্ট্রাক্টরি, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা, এই সমস্ত জিনিস সরকারে থাকাকালীন তাদের বহু কর্মী সব জায়গায় করল। সমস্ত অঞ্চলে সিপিএমকে ভোট না দিলে পাড়ায় থাকতে পারবে না, গ্রামাঞ্চলে চাষ করতে পারবে না — এইসব করেছে। সিপিএম যেখানে-সেখানে হামলা করেছে, মারপিট করেছে, খুন করেছে। আন্দোলন করার অপরাধে আমাদের দলের ১৬১ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে বললেন, তাঁরা নাকি কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেননি। আমাদের দলের কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, ৯ বার এমএলএ হয়েছিলেন যিনি, তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যাবজ্জীবন বন্দি করে দেওয়া হল। একইভাবে আরও ৪৯ জন যাবজ্জীবন দণ্ডিত হয়েছেন। সিপিএম করেছে এসব জিনিস। হাজার অপরাধ করলেও সিপিএমের লোকের বিরুদ্ধে কোন থানায় কোনও ডায়েরি বা এফ আই আর করা যেত না। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক কারা হবে দল ঠিক করে দিত, কার ট্রান্সফার হবে, কার প্রমোশন হবে, কার ডিমোশন হবে, তাদের সরকারি কর্মচারী সমিতি ঠিক করে দিত। আজকে যা যা তৃণমূল করছে সবই সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। এই পরিবেশ কে সৃষ্টি করেছে? সিপিএম নয় কি? আজকে সিপিএমের এই সঙ্কট কেন? পশ্চিমবাংলার মানুষ কেন তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিল গত বিধানসভা এবং লোকসভায়? এবারের লোকসভায় না হয় তৃণমূল ব্যাপক রিগিং করেছে, আগেরটাতে তো হয়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনেও হয়নি। তখন তো সিপিএমই সরকারে ছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে ভিত্তি করে সে সময় মানুষ রায় দিয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে সিপিএম বিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। সিপিএম নেতারা কি নিজেদের অন্যায় স্বীকার করছেন? তাঁরা কর্মীদের দোষারোপ করে বলছেন, কর্মীদের ঔদ্ধত্য, দম্ভের জন্য এ সব হয়েছে, কর্মীরা জনসংযোগ হারিয়েছে। এভাবে নিজেদের অপকর্মের বোঝা কর্মীদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। কর্মীদের তাঁরাই তো এসব শিখিয়েছেন। এ সব করলে সিপিএমের নেতারা কোনও দিন জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবেন না। যদি তাঁদের সৎ সাহস থাকে পশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে তাঁরা তাঁদের অন্যায় স্বীকার করুন। বলুন, ৩৪ বছর ধরে এ সব যা যা আমরা করেছি সেটা বামপন্থার বিরোধী, জনস্বার্থবিরোধী। এই প্রসঙ্গে মহান লেনিনের একটি অমূল্য শিক্ষার উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, "একটা কমিউনিস্ট পার্টি কতটা শ্রমিক শ্রেণির ও শোষিত জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও সিরিয়াস, সেটা বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, সেই দল ভুলের প্রতি কী মনোভাব গ্রহণ করে। খোলাখুলিভাবে সেই ভুল স্বীকার করা, ভুলের কারণগুলো খুঁজে বের করা, কোন পরিস্থিতিতে এই ভুলগুলি জন্ম নিয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করা, একে কী উপায়ে সংশোধন করা যায় সেটা গুরুত্ব

সহকারে বিচার করা — এটাই একটা কমিউনিস্ট দলের সিরিয়াসনেসের লক্ষণ। এটাই তার কর্তব্য পালনের প্রমাণ। এইভাবে সেই দল নিজেকে, শ্রমিক শ্রেণিকে এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে।" (লেফট্ উয়িং কমিউনিজম - অ্যান ইনফেনটাইল ডিসঅর্ডার)। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিভাবে সৎ মন নিয়ে তার ভুল স্বীকার করে। সেই সৎ সাহস কি তাদের আছে? কাল কাগজে দেখলাম তাদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এক নেতা বলছেন, ঐ জেলায় তাঁদের দলের এক হাজার সদস্য ভয়ে নির্বাচনে কাজে নামেনি। এমনই বিপ্লবী দল! কীসের ভয়? ওদের হাতে তো মার খেয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। আমাদের মতো একটা দলের ১৬১ জন নেতা-কর্মীকে তারা মার্ডার করেছে। আজকের সভার স্থানেই একটা শহিদ বেদি আছে কমরেড মাধাই হালদারের, যাকে সিপিএম সরকার গুলি করে মেরেছে ১৯৯০ সালে। আমরা তবুও লড়াই করে গেছি। তৃণমূল কতটা কী করেছে তাদের? তাদের এই ১০০০ সদস্য তা হলে কী ধরনের সদস্য? পশ্চিমবঙ্গে তাদের দলের কয়েক লক্ষ সদস্য, গণসংগঠনগুলিরও লক্ষ লক্ষ সদস্য আছে। কথায় কথায় ব্রিগেড ভর্তি করতেন। আজ কোথায় গেল সবাই? কেন এমন হল? কারণ তারাই তো কর্মীদের কাপুরুষ বানিয়েছেন। আসলে নেতারা কোনও রাজনীতি বোঝাননি, আদর্শ বোঝাননি, বামপন্থার শিক্ষা দেননি। বুঝিয়েছেন, আমাদের দল বড়, আমরা সরকারে আছি, আমাদের দলে থাকলে এই এই সুবিধা পাওয়া যায়। পুলিশ আমাদের হাতে আছে, সাত খুন করলেও মাফ হবে, কেউ গায়ে হাত দিতে পারবে না। ফলে পুলিশ পক্ষে থাকলে সমাজবিরোধীদের নিয়ে তারা মহাবীর হয়ে যায়। তাঁরা ছাত্রদের বলেছেন, কোনও পরীক্ষা না দিলেও প্রমোশন হবে, ভালো রেজাল্ট হবে। এইসব দিয়ে দল ভারী করেছেন। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অন্য সংগঠনকে লড়তে পর্যন্ত দিতেন না। আজ তৃণমূল একই জিনিস করছে, ওরাই তো শিখিয়েছে। সিপিএমের ট্রেনিং পাওয়া ক্রিমিনালরাই এখন তৃণমূলের ঝান্ডা বহন করছে, সেই পুলিশরাই এখন তৃণমূলের হুকুমে চলছে। ফলে পুলিশ ও ক্রিমিনালরা হাতে থাকলে তারা শক্তিশালী ও মহাবীর থাকে, আর না থাকলে দুর্বল ও কাপুরুষ হয়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষ তাদের বামপন্থী গণ্য করায় আজ সিপিএম বিরোধিতা বামপন্থা বিরোধিতার রূপ নিচ্ছে। এভাবেই তারা বামপন্থার সর্বনাশ করেছেন।

বিজেপি-র মাথা তোলার জমি করে দিয়েছে সিপিএম

কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৭৭ সালে সিপিএমের সরকারে যাওয়া দেখে যাননি, সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসন দেখেননি। ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে তিনি সিপিএমকে দেখেছিলেন এবং তখনই তিনি বলেছিলেন, "বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে যখন তথাকথিত মার্কসবাদী দল সিপিএমের শক্তি সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের দাপটে দেশের মানুষ

ছিল সন্ত্রস্ত। ... তাদের প্রভাবিত লোকদের মধ্যেই বেশি করে পুলিস এবং প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় সুযোগসুবিধা নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। সামাজিক কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। ভিন্ন মতের লোকদের প্রতি আদর্শগত সহিষ্ণুতা গড়ে ওঠার পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশে কাপুরুষোচিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। আর এসবেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এ রাজ্যে শাসক কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতা দখলের পর যখন তাদের পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল তখন দেখা গেল ফ্রন্টের আমলের সেই 'দুর্দান্ত বিপ্লবীদের' টুঁ শব্দটি করার পর্যন্ত সাহস নেই। পুনরায় অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আবার হয়তো আপনারা দেখবেন তারা আগের সেই মূর্তিই পরিগ্রহ করেছে। যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখা দিতে শুরু করেছে। যদি তাদের রাজনীতি সত্যিই বিপ্লবী রাজনীতি হত, তবে একদিকে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে তারা পেত আশীর্বাদ আর শোষক বুর্জোয়া শ্রেণির কাছ থেকে তারা লাভ করত তীব্র ঘৃণা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঠিক তার উল্টোটা।" (যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজ কর্মের কয়েকটি দিক, রচনাবলী তৃতীয় খন্ড) । এই হল ১৯৭০ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে সিপিএমের আচরণ দেখে যা বলেছিলেন। তারপর ৩৪ বছরের শাসনের সময়ে তাদের এইসব আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়েছে। শ্রেণিসংগ্রামের বিরুদ্ধে, গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশকে আরও হিংস্রভাবে ব্যবহার করেছে। অন্য দলের কর্মীদের ওপর আক্রমণ, সন্ত্রাস সৃষ্টি, পুলিসকে ব্যবহার এবং পুলিসের মধ্যে দলতন্ত্র কায়েম, প্রফেসর-শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে দলতন্ত্র কায়েম এসবই তারা করেছে। ফলে বামপন্থার যদি কেউ ক্ষতি করে থাকে, সর্বনাশ করে থাকে সে ক্ষতি তৃণমূল করেনি, অন্য কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি করেনি, করেছে সিপিএম। ফলে সিপিএম নেতাদের বলব অযথা কর্মীদের দোষারোপ করবেন না। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুন। যদি সৎ সাহস থাকে খোলামনে আপনারা বলুন ৩৪ বছরের শাসনে আমরা এই এই অন্যায় করেছি, আমরা সংশোধন করছি, আমরা সংশোধন করব। ফাঁকি দিয়ে এই কাজ হবে না। এখন দেখুন, মানুষ তৃণমূলের খুব সমালোচনা করছে। তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাদের অভিযোগ ও বিচারটা হচ্ছে, সিপিএমের মতোই তো তৃণমূল করছে। তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে সিপিএমকে ভাবতে পারছে না কেন? কারণ বিগত ৩৪ বছরের শাসনে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর জন্য সিপিএমই দায়ী।

পশ্চিমবাংলায় বিজেপি যতটুকু জায়গা করতে পারল সেটা সিপিএম নেতাদের জন্যই। কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটা উক্তি আমি আপনাদের শোনাতে চাই। এটা ১৯৬৯ সালের বক্তব্য, আপনারা মিলিয়ে দেখুন এই মহান চিন্তানায়কের কীরকম অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল। তখন বিজেপি ছিল না, জনসংঘ ছিল। সিপিএম সম্পর্কে সমালোচনা করে তিনি গভীর উদ্বেগে বলছেন, "এই পরিস্থিতিতে

জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতারা বুঝছেন না। তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসের মত বড় বড় বুকনি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এখানে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন।" (যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক, রচনাবলী তৃতীয় খন্ড)। কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৯ সালে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন — সিপিএম কমিউনিজমের সুনামকে কালিমালিপ্ত করছে, বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছে, জনসংঘ ওঁৎ পেতে বসে আছে, এর সুযোগ নিয়ে তারা ক্ষমতা বাড়াবে। আজকের দিনের সাথে এই বক্তব্য মিলিয়ে নিন। এই ৩৪ বছর ধরে সিপিএম বিজেপি-র অভ্যুত্থানের জমি তৈরি করে দিয়েছে বামপন্থার সর্বনাশ করে। এই কথাটাও আমি আপনাদের বলতে চাই।

আমাদের সিপিএমের প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই। কোনও দল বা নেতার প্রতিই বিদ্বেষ নেই, অন্যদের সাথে আমাদের বিরোধ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় আদর্শগত-নীতিগত। ফলে সিপিএম নেতারা নিজেদের অন্যায় স্বীকার করুন। ওপর ওপর কিছু কথা বলা নয়, চুনকাম করা নয়, নিছক কিছু নেতার বদল নয়, চাই নীতির পরিবর্তন। যথার্থ সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের রাস্তায় সিপিএম ফিরে আসুক। এ তাঁরা পারবেন কি? সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকদের উচিত নেতৃত্বের কাছে এই প্রশ্নটা রাখা। আমরা তো যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে সংগ্রামী বামপন্থী ভূমিকা নিয়েই দীর্ঘ দিন চলছি। তাঁরা সংগ্রামী বামপন্থাকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এই সত্য তাঁরা স্বীকার করবেন তো? এখানেই তো পরীক্ষা! না হলে জনগণ কী করে তাঁদের বিশ্বাস করবে? সততা আন্তরিকতা নিয়ে জঙ্গি শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসগ্রাম ছাড়া বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা যায় না। মিথ্যার দ্বারা, প্রতারণা ও চালাকির দ্বারা এ কাজ হতে পারে না।

আবার তাদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থক ও বামপন্থী জনগণকেও বুঝতে হবে, বিষয়টা এমন নয় যে সিপিএম কিছু ভুল করেছে মাত্র। এই ভুলের চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। তা হলেই দেখা যাবে, তারা যা কিছু করেছে, একটা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ীই করেছে। কমিউনিস্ট লেবেল থাকলেই যদি কমিউনিস্ট হওয়া যায়, তাহলে রাশিয়ার মেনশেভিক দল কমিউনিস্ট হয়ে যেত, লেনিনকে আলাদা বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলতে হত না, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেরও সংশোধনবাদী অধঃপতন হত না। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরে সিপিএম পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিরোধী দল হিসাবে গণআন্দোলনে যে ভূমিকা নিয়েছিল, সেটাও ছিল একটি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভূমিকাই, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে আপসকামী শক্তিরই ভূমিকা। একইভাবে সরকারি ক্ষমতায় বসে

দলের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র অনুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে বুর্জোয়া দলের মতোই আচরণ করেছে। ফলে যাদের কমিউনিজমের প্রতি আবেগ আছে তাদের অবশ্যই মোহমুক্ত হয়ে এই দলকে পরিত্যাগ করে যথার্থ মার্কসবাদী দলকে চিনে নিয়ে সেই দলকে শক্তিশালী করতে হবে। দীর্ঘদিন দলে আছেন বলে অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন থাকবেন না বা হতাশায় ভুগবেন না যদি সত্যিই কমিউনিজম ও বামপন্থাকে শক্তিশালী করতে চান।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে দাসখত দিয়েছে বিজেপি

আগেই বলেছি, বিজেপি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এবারকার নির্বাচনের আগে দেশি এবং বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণি, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, কর্পোরেট সেক্টর, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কংগ্রেসকে দিয়ে এখন হচ্ছে না, এতদিন কংগ্রেসকে দিয়ে তারা কাজ করিয়েছে, এবার তারা বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাবে এবং গোটা নির্বাচনে তারা কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বিজেপি'র প্রচারের জন্য। যে নরেন্দ্র মোদি গোটা ভারতবর্ষে গুজরাট দাঙ্গায় কলঙ্কিত নাম হিসাবে পরিচিত ছিল, যার হাত রক্তাক্ত — রাতারাতি খবরের কাগজ, টিভিতে প্রচারের দৌলতে সেই নরেন্দ্র মোদি হয়ে গেল ভারতের ত্রাতা। এইভাবে বুর্জোয়ারা রাতারাতি নেতা বানায়। কর্পোরেট সেক্টর, বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে বিজেপির বোঝাপড়া হল সরকারে বসে পুঁজিপতিরা যা বলবে মোদি সরকার তাই করবে, যেমন এখন গদিতে বসেই তাই করছে। অন্য দিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর এস এস, যে বিজেপির মতাদর্শগত অভিভাবক, সেই আর এস এস ঢালাও সুযোগ পেয়ে গেল হিন্দুত্ববাদের আদর্শের প্রচার চালাতে— শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, মননজগতে। ক্ষমতায় বসেই ডিফেন্সে, রেলে ও বিমায় বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণ ব্যাপক ও জোরদার করছে। এগুলো কংগ্রেসও আনছিল, কিন্তু তার কোয়ালিশন শরিকদের জন্য সবটা পারছিল না, সেটা বিজেপি এক ধাক্কায় নিয়ে এল। এক ধাক্কায় রেল ভাড়া, রেলের মাশুল বাড়িয়ে দিল। নানা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু সাবসিডি দিচ্ছিল, তা বন্ধ করে দিচ্ছে। সমস্ত জ্বালানি তেলের দাম বাড়াচ্ছে। এগুলি হচ্ছে সব তেতো ওষুধ। এবং আরও তেতো ওষুধ খাওয়াবে। একটা অভিনব তত্ত্বও এনেছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী। সেটা হচ্ছে 'প্রো-বিজনেস প্রো- পুওর' থিওরি। বলছেন ধনীদের যত সম্পদ বাড়বে, তত গরিবের উপকার হবে। মানে ধনীরা দয়া করে ভিক্ষা দেবে গরিবদের। সাধারণ মানুষ জানে, আমরা জানি, গরিবকে মেরেই ধনীরা ধনী হয়, শ্রমিকদের শোষণ করে মালিকরা লাভ করে। আর ওরা বলছে মালিকের যত লাভ বাড়বে, তাতেই নাকি শ্রমিকদের উপকার হবে। এই হচ্ছে 'প্রো-বিজনেস, প্রো-পুওর' থিওরি। এই সম্পর্কে আরও দু'চার কথা আমি পরে বলব।

বিজেপি শাসন ফ্যাসিবাদের বিপদ বাড়াল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, যখন প্রচার হয়ে গিয়েছিল জার্মানি-ইটালির পরাজয় মানে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন যে, ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালি হারলেও, ফ্যাসিবাদের পরাজয় হয়নি। বলেছিলেন, উন্নত-অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের আজকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। বলেছিলেন, পুঁজি যখন আজকের মতো কেন্দ্রীভূত ছিল না, মুষ্টিমেয় একচেটে পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুঁজি ছিল, অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল, তখন বুর্জোয়াদের ছিল অবাধ গণতন্ত্র। একচেটিয়া পুঁজি যখন এল, পুঁজিবাদ কনসেনট্রেটেড হল, তখন সেই গণতন্ত্র নেই। এই একচেটিয়া পুঁজি হচ্ছে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত। অন্যদিকে প্রশাসনের মধ্যে, প্রশাসনযন্ত্রের আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হচ্ছে, এটাও ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। আর বললেন, চিন্তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, যুক্তিবাদী মন নয়, তর্ক-বিতর্ক নয়, থাকবে শুধু অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস; বিজ্ঞান ততটুকু থাকবে যতটুকু মেশিন তৈরি করার জন্য, অস্ত্র তৈরির করার জন্য দরকার। মননের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ, তার সাথে কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। এই হচ্ছে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি। এ দেশে প্রথম কংগ্রেসকে দিয়ে এই ফ্যাসিবাদ কায়েম করা শুরু হয়েছিল, বিজেপি-আর এস এসকে দিয়ে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ আজ সেই কার্যক্রমটাকে আরও শক্তিশালী করছে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিরোধী বক্তব্য আরএসএস আনছে

এখন পাঠ্যসূচিতে যে বিষয়গুলি আনা হচ্ছে তা হল, গীতা-বেদ পাঠ, বৈদিক গণিত পাঠ যা ইতিমধ্যে গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে চালু হয়ে গিয়েছে। একজন বিচারপতিও পরামর্শ দিয়েছেন, পাঠ্য পুস্তকে গীতা-রামায়ণ-মহাভারত এগুলো আনা দরকার। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে। অথচ আপনারা জানেন, আমাদের দেশে নবজাগরণের সূচনা লগ্নে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রথম জ্ঞানের আলো নিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বক্তব্য কী? আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। রাজা রামমোহন রায় বলছেন, "সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এই দেশে ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা চলে আসছে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে পুনরায় তাই চালু করছে। যার ফলে মিথ্যা-অহংকার জন্মাবে। অন্তঃসারশূন্য চিন্তা, যেটা স্পেকুলেটিভ মানুষেরা করেছেন, সেটাই বাড়বে। বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না। বেদান্ত যেটা শেখায় সেটা হচ্ছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। উন্নততর ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্ক শাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি ও অন্যান্য

কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা।" (লেটার টু লর্ড আমহার্স্ট - রামমোহন রায় রচনাবলী) এ সব কে বলছেন? বলছেন রাজা রামমোহন রায়। ফলে তিনি সংস্কৃত ও বেদান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু আর এস এস-বিজেপি'র শিক্ষা হচ্ছে রামমোহন রায়ের শিক্ষাচিন্তার বিরুদ্ধে। রামমোহন রায়ের পথ ধরে এলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বলছেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-সাংখ্য-অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। কিন্তু সাংখ্য-বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়।" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। বিদ্যাসাগর বলছেন, "সাংখ্য-বেদান্ত হচ্ছে ভ্রান্ত দর্শন"। তিনি এগুলি পড়াতে চাইছেন না, কিন্তু বাধ্য হয়ে পড়াতে হচ্ছে। লক্ষ করুন, কী বলছেন বিদ্যাসাগর! এই বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। এই বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা করতেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ নিজে বলছেন, পূর্ব ভারতে আমার মতো এমন কোনও যুবক নেই, যে বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। বিবেকানন্দ জানতেন, বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন। বিবেকানন্দ জানতেন, বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। বিদ্যাসাগর বলছেন, বেদান্ত ভ্রান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত, ধর্মীয় চিন্তা ভ্রান্ত। তিনি বলছেন, "ফলে ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো উচিত, যে দর্শন পড়লে আমাদের দেশের যুবকরা বুঝবে যে বেদান্ত এবং সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন।" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। তিনি আরও বলছেন, "ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফার গোঁড়ামির চেয়েও কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে ঋষিদের মস্তিকের থেকে শাস্ত্রগুলো বেরিয়েছে— তাঁরা সর্বজ্ঞ। অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত।" বিদ্যাসাগর এভাবে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বলছেন। বলছেন, "আমাদের দেশে এমন শিক্ষক চাই — যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন, ইংরেজি জানেন। আর চাই ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত শিক্ষক।" (করুণা সাগর বিদ্যাসাগর- ইন্দ্র মিত্র)। কে বলছেন? বলছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর নিজে চারটি বই লিখেছিলেন। কোনও বইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নেই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বলছেন, "পড়াতে হবে ভূগোল, জ্যামিতি, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক দর্শন, মডার্ন ফিলোজফি, সায়েন্স, পলিটিক্যাল ইকনমি।" (করুণা সাগর বিদ্যাসাগর- ইন্দ্র মিত্র) এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি, যাঁর পদতলে এদেশের সকল বড় মানুষই মাথা নত করেছিলেন। দেখুন, এই দুই মনীষী ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করে প্রাকৃতিক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছিলেন। কংগ্রেস উল্টোটাই করেছে। বিজেপি-আর এস এস সেই উল্টো পথে আরও জোর দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও বলছেন, "ধর্মের মোহ মানুষকে নির্জীব করে রাখে। তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে-মজ্জাতে নির্দিষ্ট করে ফেলে। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সে হতভাগ্য দেশে সর্বপ্রকার দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক অমঙ্গল অব্যাখ্যাত, অচল হয়ে যায়।" এই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র বলছেন, "কোনও ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত হতে পারে না।

বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই। ... সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় শত্রু আর নেই।... কোনও দেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা বর্তমান কালে সেই বৈশিষ্ট্য মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কি না। এ ছাড়া সমস্ত শুধু অন্ধ মোহ। মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই।"(পথের দাবী)। এই বলেছেন শরৎচন্দ্র। এঁরাই হচ্ছেন সেই যুগের নবজাগরণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কংগ্রেস ও বিজেপি-আর এস এস এঁদের চিন্তার বিরুদ্ধতা করছে ফ্যাসিবাদী মনন গড়ে তোলার হীন উদ্দেশ্যে।

এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কী বলেছেন

এবার আরেকটা ঘটনা বলি। সুভাষচন্দ্র বিদেশ যাওয়ার আগে অন্তরীণ ছিলেন স্বগৃহে। তাঁর আগে তিনি ছিলেন আলিপুর জেলে। আলিপুর জেলে তিনি আমরণ অনশন করেছিলেন কয়েকটি দাবিতে। ওই সময় তিনি ভেবেছিলেন, ব্রিটিশরা তাঁর দাবি মানবে না, ফলে তাঁকে শেষপর্যন্ত হয়তো যতীন দাসের মতো শহিদ হতে হবে। তিনি দু'টি নিবন্ধ লিখে গিয়েছিলেন— একটা তাঁর দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নির্দেশ, আর একটা ভারতীয় যুবকদের উদ্দেশ্যে গাইডেন্স। এখানে আমি বলতে চাই, সুভাষচন্দ্র প্রথম জীবনে বেদান্তে বিশ্বাস করতেন, বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন এবং বস্তুবাদে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পরের দিকে ক্রমশ হেগেলের ডায়ালেকটিকসের দিকে ঝুঁকতে থাকেন এবং শেষে কী বলছেন আমি পড়ে শোনাচ্ছি। সুভাষচন্দ্র বলছেন, "পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, তা জেনে আমাদের খোলা মনেই থাকা উচিত। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত, বস্তুবাদ সম্পর্কে আমাদের পুরনো যে ধারণা ছিল, সেটা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অন্য দিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান এই দুইয়ের আক্রমণে সেটা পর্যুদস্ত।" (ক্রস রোডস- সুভাষ চন্দ্র বসু) অর্থাৎ তিনি তো আগে বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, ফলে বস্তুবাদ সম্পর্কে আগে তাঁর যে ধারণা ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যুক্তিতে সেটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বোঝা যায়, এ কথা বলেছেন যাতে এ দেশের ছাত্র-যুবকরা ভুল না করে যেটা যৌবনে তিনি করেছিলেন। একইভাবে শহীদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং যুবকদের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য 'কেন আমি নাস্তিক' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার আগে এক বৃদ্ধ কয়েদী পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, তুমি তো এতদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করনি, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে অন্তত গীতা পাঠ কর। ভগৎ সিং হাসিমুখে উত্তর দিলেন, আমার গীতা হচ্ছে মহান লেনিনের পুস্তক, তা আমি পাঠ করেছি। আমি এঁদের কথাগুলো শোনাচ্ছি এই জন্য যে, আজকে বিজেপি যা বলছে, যা করতে যাচ্ছে, তা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-

সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিংরা যা শিখিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ তার বিরোধী। আমরা কাকে মানব? মার্কসবাদও যদি আপনারা না মানতে চান, আমাদের দলকেও যদি না মানতে চান, পশ্চিমবাংলার জনগণ, ভারতবর্ষের জনগণকে ভাবতে হবে, এই সব বড় মানুষদের অস্বীকার করে আবার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের দিকে কি আমরা চলে যাব? বেদ-বাক্য অভ্রান্ত, মনুসংহিতার বিধানই শেষ কথা— এই ভাবনার যুগে চলে যাব? এ সবের বিরুদ্ধেই তো লড়াই করেছেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-সুভাষ বোস-নজরুলরা। কোনটা অনুসরণ করবেন? কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এরা দেশকে? এ সবই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের চিন্তাগত ভিত্তি স্থাপন করার নক্সা। এই কথাটাই আমি আপনাদের বলতে চাই।

কে যথার্থ হিন্দু — বিবেকানন্দ না বিজেপি-আরএসএস

বিজেপি-আর এস এস বিবেকানন্দের ছবি টাঙায়, তারা বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী নাকি চলছে? অথচ দেখুন আর এস এসের এক নেতা, গোলওয়ালকর তাঁর নাম, আর এস এস তাঁকে গুরু বলে মানে, তিনি লিখছেন, "হিন্দুস্থানের সমস্ত অ-হিন্দু মানুষ হিন্দু ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করবে। হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে। হিন্দু জাতির গৌরবগাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না।... না হলে সম্পূর্ণভাবে এই দেশে হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনও সুবিধা ছাড়া, কোনও রকম পক্ষপাতমূলক ব্যবহার ছাড়া, এমনকী নাগরিকত্বের অধিকার ছাড়া তাদের এ দেশে থাকতে হবে।" (উই অর আওয়ার নেশন হুড -গোলওয়ালকর) অর্থাৎ যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নন, তাঁদের হয় হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ভাষা মানে সংস্কৃত ভাষা, একে মান্য করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। আর এ যদি তাঁরা না করেন, তা হলে এ দেশে কোনও অধিকার তাঁদের থাকবে না। এই হচ্ছে আর এস এসের গুরু গোলওয়ালকরের হুকুমনামা। এটা বিস্ময়কর নয় যে ফ্যাসিস্ট হিটলার যখন রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, বার্ণার্ড শ, রম্যাঁ রলাঁ সহ বিশ্বের জনগণ দ্বারা নিন্দিত, তখন গোলওয়ালকরজী হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখলেন, "জার্মানীর জাতীয় গৌরববোধ আজকের দিনের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। নিজস্ব জাতির ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেমেটিক রেইস ইহুদীদের বিতাড়ণ করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জাতীয় গর্ববোধ এখানে সবচেয়ে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানী দেখিয়ে দিয়েছে যে কেন বিভিন্ন ধরণের জাতি ও সংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার থেকে আমরা হিন্দুস্থানীরা শিখতে ও লাভবান হতে পারি।" (উই অর আওয়ার নেশন হুড -গোলওয়ালকর) এ তো ফ্যাসিস্ট হিটলারের. প্রতিধ্বনি!

আমি এবার বিবেকানন্দ কী বলছেন আপনাদের তা পড়ে শোনাচ্ছি। বিবেকানন্দ বলছেন, "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি

গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে উঠবে।... আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেল নাই, কোরানও নাই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ-বাইবেল ও কোরানকে সমন্বয় করেই।... আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) এ সব কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। তা হলে বিবেকানন্দ হিন্দু, না আর এস এস-বিজেপি নেতারা হিন্দু? বিবেকানন্দ বলছেন, "আমার যদি একটা সন্তান থাকত, তাকে মনোসংযোগের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে এক পংক্তির প্রার্থনা ছাড়া আর কোনও প্রকার ধর্মের কথা আমি শিখতে দিতাম না। তার পর সে বড় হয়ে খ্রিস্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ যাঁকে ইচ্ছা উপাসনা করতে পারবে। ... সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) এবার বিচার করুন বিবেকানন্দ হিন্দু, না বিজেপি-আর এস এস নেতারা হিন্দু? ওরা বলে এ দেশে ইসলাম ধর্মের বিস্তার মুসলমান রাজারা, সম্রাটরা অস্ত্রের জোরে করেছে। আর এর বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ বলছেন, "ভারতের মুসলিম বিজয় নির্যাতিত গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেই জন্য এ দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এসব শুধু অস্ত্রের জোরে হয়নি, অস্ত্রের জোরে আর ধ্বংস করে এ কাজ হয়েছিল এমন চিন্তা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জমিদারদের, পুরোহিতদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) অর্থাৎ বলছেন, হিন্দু জমিদার এবং পুরোহিতদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গরিব নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিল। কে বলছেন? বলছেন, স্বয়ং বিবেকানন্দ। তা হলে কে ঠিক? আর এস এস না বিবেকানন্দ ? এদের কোনও নৈতিক অধিকার আছে বিবেকানন্দের ছবি বহন করার?

বিজেপি নেতারা বাবরি মসজিদ ভাঙল, যেটা একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, যেমন আফগানিস্তানের তালিবানরা বুদ্ধের মূর্তি ভেঙেছিল। বাবরি মসজিদে কেউ নমাজও পড়ত না, জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। স্রেফ ভোটের জন্য পৌরাণিক কাল্পনিক চরিত্র রামচন্দ্রের নামে সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে মসজিদ ভাঙল। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আগেও যে প্রশ্ন করেছিলাম, সেটা হচ্ছে চৈতন্য কি হিন্দু ছিলেন? রামকৃষ্ণ কি হিন্দু ছিলেন? বিবেকানন্দ কি হিন্দু ছিলেন? তাঁরা কি জানতেন না বাবরি মসজিদ কোথায় এবং কী তার ইতিহাস? তাঁরা তো হিন্দুদের বলেননি যে, এই মসজিদ ভেঙে রামমন্দির কর। একটা মিথ্যা কথা বলে, স্রেফ ভোটের দিকে তাকিয়ে এতবড় একটা ঐতিহাসিক সৌধকে তারা ভাঙল এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাল। তারা কি জানত, রামকৃষ্ণ নিজে মসজিদে নমাজ পড়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন। মন্দির প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, "কোটি টাকা খরচা করে, কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো ঐ ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো ঐ

ঠাকুর আঁটকুড়ির ব্যাটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে আসল জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বস্ত্র বিনা মরছে।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) বিবেকানন্দ বলছেন, আসল যে গরিব মানুষ, তার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আর তোমরা কত মন্দির করছ, সোনার অলঙ্কার পরাচ্ছ। এ সবকে বিবেকানন্দ ধিক্কার দিচ্ছেন। বিজেপি-আর এস এস নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিবেকানন্দ বলছেন, "ফার্স্ট ব্রেড অ্যান্ড দেন রিলিজিয়ান।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) আগে রুটি চাই, খাদ্য চাই, তারপর ধর্মের কথা বলব। বিবেকানন্দ বলছেন, "শুধু ভারতবর্ষের মানুষই নয়, একটা প্রাণীও যদি অনাহারে থাকে— আমার একমাত্র ধর্ম হবে তাদের খাওয়ানো।" "সো লং অ্যাজ ইভন এ সিঙ্গল ডগ ইন মাই কান্ট্রি হ্যাজ নো ফুড, মাই হোল রিলিজিয়ান উইল বি টু ফিড দেম।"(বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) বিজেপি-আর এস এস নেতারা এ সম্পর্কে কী বলবেন? এই বিবেকানন্দকে তাঁরা কি চেনেন? আমরা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করি। তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন, আর আমরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী। এখানে আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্তু তিনি বড় মানুষ ছিলেন। তিনি ভোটের রাজনীতি করেননি, মিথ্যাচার করেননি। এমন কথা পর্যন্ত তিনি বলেছেন, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কে হবে? "জনগণ শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে, তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ অশিক্ষার কালো মেঘ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, এই সব ভাবনা কি তোমাদের অস্থির করে তুলছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলছে? দেশপ্রেমিক হওয়ার এই হল প্রথম সোপান।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) এই বিবেকানন্দকে গদিতে আসীন বিজেপি-আর এস এস নেতারা চেনেন? বিবেকানন্দের দুটি চরিত্র — একদিকে তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী অধ্যাত্মবাদী; আর এক দিকে এ দেশে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তিনিই ঘটিয়েছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী এবং যতটুকু মানবতাবাদের ঝান্ডা তিনি তুলে ধরেছিলেন সেই মানবতাবাদী বিবেকানন্দকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং তাঁকে আমরা বড় মানুষ মনে করি। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, একদিকে বাস্তব জগতে দারিদ্র, অশিক্ষা, অত্যাচার জাতীয়তাবাদী-মানবতাবাদী বিবেকানন্দকে কাঁদাচ্ছে, ব্যথা-বেদনায় ছটফট করাচ্ছে, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তোলাচ্ছে, অন্যদিকে যে অধ্যাত্মবাদী বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই দর্শন বলছে, "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য"। অর্থাৎ জগতের সব কিছুই মায়া, কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, ফলে দুঃখ-দারিদ্রও মায়া। এটাই এত বিরাট এক মানুষের ক্ষেত্রে একটা বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডি। অথচ দেখুন, কত বড় মানুষ হলে বলতে পারেন, "যতদিন ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক দারিদ্র এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত, অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।... যতদিন ভারতবর্ষের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ

তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।" (বাণী ও রচনা-বিবেকানন্দ) বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের মানদণ্ডে আমাদের দেশের আজকের 'দেশপ্রেমিক' 'জনদরদি' নেতাদের স্থান কোথায়? মার্কসবাদী হয়ে মতবাদের পার্থক্য থাকলেও আমরা সমস্ত বড় মানুষের স্বপ্নকে, তাঁরা শোষিত মানুষের জন্য যতটুকু ভেবেছেন, সমস্ত যুগে যে ভাবে ভেবেছেন, তাকে আমরা শুধু শ্রদ্ধা নয়, বোঝবার জন্য সংগ্রাম করি।

মানব ইতিহাসে ধর্মের যথার্থ স্থান মার্কসবাদই দেখিয়েছে

এখানে আমি বলতে চাই, আমরা ধর্মপ্রচারকদের শ্রদ্ধা করি। মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করা হয়। আমরা বলি, ধর্ম তার যুগে প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল, কোনও কোনও ধর্ম সংগ্রামী ভূমিকাও নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম যুগে মানব সমাজে ঈশ্বরচিন্তা ছিল না, ধর্মীয় চিন্তা ছিল না— এটা মার্কসবাদ দেখিয়েছে, ইতিহাস দেখিয়েছে। আপনারা এখন যান আন্দামানে, দেখবেন সেখানে জারোয়া বলে এক শ্রেণির আদিম মানুষ আছে। এরা কাপড় পরতে জানে না, এদের কোনও সম্পত্তি নেই, ঘরবাড়ি নেই, এদের মধ্যে ধনী-গরিব নেই, এদের কোনও শাসক নেই, এরা কোনও ঈশ্বরও মানে না, এরা কোনও পূজাও করে না। এরকমই ছিল সকল দেশের আদিম যুগ। এটাই মার্কসবাদ দেখিয়েছে।

আমি আবার বিবেকানন্দ থেকে পড়ে শোনাই। বিবেকানন্দের অন্ধ ভক্তরা হয়ত একটু অসন্তুষ্ট হবেন কারণ বিবেকানন্দই তাঁদের বিপদে ফেলেছেন। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ লাহোরের বক্তৃতায় বলছেন, "এই বিশ্বে মানুষ প্রথম বাইরের প্রকৃতিজগতের মধ্যেই সত্য খুঁজেছিল। এটা ছিল সেই চেষ্টা যেটা হচ্ছে বস্তুময় জগৎ থেকেই মানুষের জীবনের সমস্যার উত্তর খোঁজা।" (অদ্বৈত বেদান্ত, দি সায়েন্টিফিক রিলিজিয়ন) বিবেকানন্দ নিজে বলছেন, মানুষের প্রথম চিন্তা ছিল এই বস্তুময় জগতকে নিয়ে, এই প্রকৃতিজগতকে নিয়ে। এখানেই বিবেকানন্দের বড়ত্ব। তিনি ইতিহাসের সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ফলে প্রথম যুগে ধর্মীয় চিন্তা ছিল না। ধর্ম এসেছে দাসপ্রথার যুগে, যখন শাসক-শাসিত শোষক-শোষিত সম্পর্ক সমাজে এল। এখানে ধর্মের অভ্যুত্থান পর্ব সম্পর্কে মার্কসের একটি ঐতিহাসিক উক্তি পড়ছি। মার্কস বলছেন, "ধর্মীয় দুঃখ একইসাথে প্রকৃত দুঃখেরই প্রকাশ এবং প্রকৃত দুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়, বিবেকহীন পরিস্থিতির বিবেক।" (ক্রিটিক অফ হেগেলস্ ফিলসপি অফ রাইট) প্রথম যুগের ধর্মকে কতটা উঁচুতে স্থান দিয়ে মার্কস একথা বলে গিয়েছেন! সেই যুগে অত্যাচারিত দাসদের চোখের জল, কান্না এই নিয়েই একদল চিন্তানায়ক এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, সমাজে যেমন প্রভু আছে, তার হুকুমে সমাজ চলছে, তাহলে বিশ্বেরও প্রভু আছে, যার নির্দেশে বিশ্ব চলছে। ফলে আমরা সকলেই এই বিশ্বপ্রভুর সন্তান। দাসপ্রভুও তার সন্তান, দাসও তার সন্তান। ফলে বিশ্বপ্রভুর

বিধান অনুযায়ী সমাজ চলবে, শাসকদেরও সেই বিধান মানতে হবে। তখনকার দিনে চিন্তা কী, মন কী, কীভাবে আমরা ভাবি, এর কোনও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর ছিল না, সম্ভবও ছিল না। সেটা অনেক পরে মার্কসবাদ উন্নত স্তরের বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে এসবের উত্তর দিয়েছে। দেখিয়েছে বাস্তব পরিবেশের সাথে মানুষের মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চিন্তার উদ্ভব, পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে চিন্তারও পরিবর্তন ঘটে। তখনকার যাঁরা চিন্তানায়ক তাঁরা মনে করতেন, আমার মনকে বিশ্বপ্রভু ভাবাচ্ছে, তিনিই আমার চিন্তা দিচ্ছেন। ফলে আমার মনে সমাজের কল্যাণের জন্য যে বক্তব্য পাচ্ছি, চিন্তা পাচ্ছি, এটা বিশ্বপ্রভুরই দেওয়া। তাঁদের কাছে এই হচ্ছে ভগবানের বাণী, আল্লার আদেশ, গডের নির্দেশ — এইভাবে ধর্মীয় চিন্তা এসেছিল। এইজন্যই মহান এঙ্গেলস খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, "খ্রিষ্ট ধর্ম এবং শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র উভয়েই ভবিষ্যতের দাসত্ব ও দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তি আসবে প্রচার করে; খ্রিষ্ট ধর্ম মনে করে এই মুক্তি আসবে মৃত্যুর পরে স্বর্গে, আর সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে মুক্তি আসবে এই পৃথিবীতে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে।" (অন দি হিস্ট্রি অফ আরলি ক্রিস্টাইনিটি- এঙ্গেলস) খ্রিস্ট ধর্মের উল্লেখ করলেও তিনি আদতে সব ধর্ম সম্পর্কেই একথা বলেছেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "খ্রিষ্টধর্মের ... ধারণাকে পাথেয় করেই দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে দাসরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষার ভিত্তিতে তারা এই যুক্তি উত্থাপন করতে শুরু করে যে, দাসপ্রভুরা দাসদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে আসলে খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসনেরই বিরুদ্ধাচারণ করছে। তারা বলতে থাকে যে, দাসদের উপর অত্যাচার করা মানে খ্রিষ্টধর্মের অবমাননা করা। ... এদিক থেকে বিচার করলে খ্রিষ্টধর্ম দাসপ্রভুদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং সেই অর্থেই একসময় সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এধরনের নজির পাওয়া যায়। আর একটি দিক থেকেও বিষয়টিকে ভেবে দেখা দরকার। ... সমাজবিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায়-অন্যায় বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজকে সংহত, সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে এবং সেইদিক থেকেও ধর্ম সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে।" (শিবদাস ঘোষ রচনাবলী, ২য় খন্ড) এই অর্থে ধর্মপ্রচারকদের আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। বরং আপনারা অনেকেই জানেন না, ধর্মকে প্রথম আঘাত করেছিল বুর্জোয়া চিন্তাবিদরাই নবজাগরণের যুগে ইউরোপে ১৬-১৭-১৮ শতাব্দীতে তৎকালীন উদীয়মান পুঁজিবাদের স্বার্থে। তখন বুর্জোয়ারা মাথা তুলছে, পুঁজিবাদ মাথা তুলছে, রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করছে। তখন বলা হত, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, বাইবেলের শাসনই ঈশ্বরের শাসন। এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে ধর্মকে আঘাত করল বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা। বেকন, স্পিনোজা, হিউম, কান্ট,

ফুয়েরবাক— এসব বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা ধর্মকে বললেন, একটা অ্যাবেরেশন অফ হিস্ট্রি। ধর্মের যথার্থ বিচার তাঁরা করেননি। তাঁদের কাছে এটা যেন ইতিহাসের একটা বিচ্যুতি, বিপথগামিতা। ফলে তা পরিত্যাজ্য। মার্কসবাদ বরং বলেছে, ধর্মের ঐতিহাসিক স্থান আছে। একটা যুগে ধর্ম প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল, আবার এ কথাও সত্য এই ধর্মের দ্বারা কি আজকের দিনের কোনও সমস্যার সমাধান হবে?

আজ আমাদের জীবনে যা সমস্যা—বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, দারিদ্রের সমস্যা, মজুরি, কর্মসংস্থান, ট্যাক্সবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ইত্যাদি যা নিয়ে মানুষের জীবন জর্জরিত, তার কোনও আলোচনা আছে রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, গীতাতে? কোথাও কোনও আলোচনা আছে? এটুকু বলা আছে যে, ন্যায়ের পথে চল, সত্যের পথে চল। কিন্তু কোন যুগে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা— এটা যুগের ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে তো। এখানেই ধর্মের সীমাবদ্ধতা। যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করেন তাঁদের সাথে আমাদের বিরোধ নেই। তাঁরা আমাদের আন্দোলনে আসুন, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করুন, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করুন, মদ ও ড্রাগের ঢালাও আয়োজন চলছে, দুর্নীতি চলছে — এ সবের বিরুদ্ধে লড়াইতে আসুন। সব ধর্মবিশ্বাসীরাই আসুন, আমরা একত্রে লড়তে পারি। আমরা কোথায় আপত্তি করি? যখন প্রচার করা হয়, তুমি গরিব কেন, তুমি না খেয়ে মরছ কেন, তুমি ধর্ষিতা হচ্ছ কেন, তোমার সন্তান হাসপাতালে মারা যাচ্ছে কেন— উত্তর হল সবই পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্টের বিধান, রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে, খোদা কা মর্জি, নসিব কা খেল, ফলে প্রতিবাদ করবে না, লড়বে না, তাঁর ইচ্ছাই কর্ম, ফলে যত কষ্ট হোক, তাঁর লীলা বলে হাসিমুখে সহ্য কর, পরজন্মে সুখ পাবে, ধনী-গরিব ভগবানেরই সৃষ্টি — এইসব যখন বোঝানো হয় তখন আমাদের সাথে বিরোধ। এটা দেখাতেই মার্কস বলেছেন, নির্যাতিত জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য ধর্মকে আফিঙের মতো ব্যবহার করছে এই শোষক শ্রেণি। আপনারা তাকিয়ে দেখুন, এত ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, কত নারী আর্তনাদ করছে, যাঁরা বিবেকানন্দের, মহম্মদের বাণী নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁরা কেউ লড়ছেন, প্রতিবাদ করছেন? দুর্নীতির বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনও মন্দিরের পুরোহিত, কোনও ধর্মপ্রচারক, কোনও মসজিদের ইমাম, কোনও গির্জার পাদ্রি, কেউ লড়াইয়ে আসছেন? আজ যদি যিশু থাকতেন, যদি হজরত মহম্মদ থাকতেন, যদি হিন্দুধর্মের প্রথম যুগের প্রবক্তারা থাকতেন, এমনকী বিবেকানন্দও যদি থাকতেন, তাঁরা কি বলতেন এসব থাক, চলুক ঈশ্বরের বিধান, আমরা পুজো করি, মানত করি? ফলে আজ ধর্ম ইতিহাসের গতিপথে কার্যকারিতা হারিয়েছে, আজ ধর্ম শোষকশ্রেণীর হাতে সুবিধাবাদের হাতিয়ার। একসময় ধর্মপ্রচারকরা মার খেয়েছেন, মার খেয়েই লড়েছেন, আর আজ এক একটা মন্দির-মসজিদ-গির্জা কোটি কোটি টাকার

সম্পত্তির মালিক। পুরোহিত, ইমাম, যাজকরা টাকার গদিতে বসে ধর্মের বাণী দিচ্ছেন। অতীতে ধর্মপ্রচারকরা তাঁর তাঁর যুগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, আর এখন ধর্মীয় প্রধানরা বোঝান কল্পিত 'পরলোকের' প্রত্যাশায় 'ইহলোকের' সকল অন্যায়-অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে পূজা-প্রার্থনায় মেতে থাকতে, যার পৃষ্টপোষক হচ্ছে বড় বড় ব্যবসাদার-শিল্পপতি-কালোবাজারিরা। এখানেই ইতিহাসের গতিপথে ধর্মের অকার্যকারিতা ঘটেছে, এ কথা আমাদের বুঝতে হবে। মহান লেনিন বলেছেন, মার্কসবাদ আকাশ থেকে আসেনি। দুনিয়ার সমস্ত যুগে যত সত্য, যত জ্ঞানের চর্চা হয়েছে, যত বড় মানুষ এসেছেন, তাঁদের ধারাবাহিকতায় নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুন সত্য নিয়ে মার্কসবাদ এসেছে। বলেছেন, "কমিউনিস্ট তারাই, সমস্ত যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে যারা চর্চা করবে।" আমরা অতীতের মহৎ ধর্মপ্রচারকদেরও জীবন সংগ্রাম চর্চা করি, তাঁদের থেকেও নেওয়ার চেষ্টা করি। সমস্ত যুগের বড় মানুষদের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করি। এটাই কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিল আরএসএস

এখন বিজেপি-আর এস এস-এর ধ্যানধারণা কত মারাত্মক, তার আরেকটি নমুনা আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব থেকেও বুঝতে পারবেন। ওদের গুরু গোলওয়ালকর বলছেন, "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ বিপদের তত্ত্বকে ভিত্তি করে আমাদের যে জাতিতত্ত্ব গঠিত হয়েছে সেটা কার্যত আমাদের হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সাথে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের ওপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছে।" (উই অর আওয়ার নেশনহুড-গোলওয়ালকর) দেখুন কী মারাত্মক বক্তব্য! গোটা ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক এলাকা, এই এলাকা জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ভিত্তি করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে সেটা নাকি সর্বনাশা! এর ফলে, তাদের মতে হিন্দু জাতীয়তার তত্ত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটাকে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ বলে যে ভাবা হয়েছে সেটা নাকি প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের কথা যে নেতারা বলেছেন, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। ওদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, হিন্দু জাতি — এই স্লোগান তোলা উচিত ছিল। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক জাতিবোধ— এই চিন্তা যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেন সহ প্রত্যেকেই প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশদ্রোহী হয়ে যান আর

এস এসের বক্তব্য অনুযায়ী। কারণ তাঁরা হিন্দু জাতির কথা বলেননি। অথচ বাস্তবে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবোধ আসতই না যদি ব্রিটিশ শাসন না আসত। ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতবর্ষের চেহারা কী ছিল? কিছু হিন্দু রাজ্য ছিল, মুসলিম নবাবরা ছিল। মুসলমানরা আসার আগে বিচ্ছিন্ন কিছু হিন্দু রাজ্য ছিল। কিন্তু তারা মিলে একটা জাতি ছিল না। ব্রিটিশরা না এলে, ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা যে যানবাহন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেই যোগাযোগের দ্বারা যুক্ত ব্যবসা বাণিজ্য, একটা সর্বভারতীয় অর্থনীতি না গড়ে উঠলে এবং তার মধ্য দিয়ে জাতীয় পুঁজি না গড়ে উঠলে আজ ভারতবর্ষে বাঙালি একটা আলাদা জাতি, ওড়িয়া, গুজরাটি, তামিল জাতি ইত্যাদি আলাদা আলাদা রাষ্ট্র হত। হিন্দু যদি ধর্মের ভিত্তিতে একটা জাতি হয় তাহলে নেপালের তো আলাদা জাতি ও রাষ্ট্র হওয়ার কথা নয়। নেপাল তো হিন্দু ধর্মের দেশ। নেপাল একটা রাষ্ট্র , কিন্তু হিন্দু হিসাবে নয়, নেপালি জাতিসত্ত্বা হিসাবে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে, আরব দুনিয়ার্য় কতগুলি রাষ্ট্র, সবাই তো মুসলিম। সব মিলে একটা রাষ্ট্র না হয়ে এতগুলি রাষ্ট্র জন্ম নিল কেন? ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান কি পূর্ব বাংলাকে ধরে রাখতে পারল? অতএব পরিষ্কার যে, ধর্মের ভিত্তিতে জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ফলে মনে রাখবেন, বিজেপির অভিভাবক আর এস এস ভারতীয় নবজাগরণের বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতবর্ষের স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধী। এইজন্যই আর এস এস স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়নি। আজ বি জে পি সরকারে বসে চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসব জিনিস চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক ভ্রান্ত ধ্যানধারণা নিয়ে ভারতকে তারা আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আসলে পুঁজিবাদের আজ এটাই প্রয়োজন। তা হলে যতই সঙ্কট বাড়ুক, মানুষ প্রতিবাদ করবে না, প্রশ্ন করবে না, তর্ক করবে না। অদৃষ্ট, কপাল, পূর্বজন্মের কর্মফল, বিধির বিধান— এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। এটাই ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি। আরও সংগঠিতভাবে বিজেপির মাধ্যমে পুঁজিবাদ এ সব করতে যাচ্ছে। যদিও এটা ঠিক যে, এ দেশে বিরুদ্ধতা আছে, ইতিপূর্বেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, একচেটিয়া পুঁজি কেন্দ্রীভূত হলেও এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক পুঁজির যে প্রাধান্য আছে তার সাথে একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব আছে, ক্ষুদ্র পুঁজি ব্যাপকভাবে আছে, আঞ্চলিকতাবাদ আছে, সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পথে সেটা বাধা। অন্যদিকে এ দেশের শিক্ষিত মহল, লিবারাল ডেমোক্র্যাটরা একটা বিরাট শক্তি, তারা সহজে এটা মানবে না। ফলে আন্দোলনে নামবে, প্রতিবাদে আসবে, লড়াই হবে। এটা বাস্তব। যদি আমরা ঠিকমতো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, এই বিপদকে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন যে আমরা হচ্ছি, এটা আমাদের মার্কসবাদী বিপ্লবী হিসাবে, বামপন্থী হিসাবে বুঝতে হবে, সাধারণ মানুষকেও বুঝতে হবে। (এই সময় জোরে বৃষ্টি শুরু হয়। কমরেড প্রভাস ঘোষ সমবেত মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি কি বলব, না এখানেই শেষ করব?' উপস্থিত জনতা চেঁচিয়ে বলেন, 'বলুন, আপনি বলে যান।')

আর এস এস যে 'হিন্দু জাতি'র ধুয়া তুলছে সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি আপনাদের স্মরণ করাতে চাই। তিনি বলছেন, "ভারতবর্ষে কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি হিসাবে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী-বিশ্বভারতী) আর এস এস এবং বিজেপি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বলছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা যদি বলতে হয়, তবে এ দেশে তো বুদ্ধদেবও ছিলেন, দীর্ঘদিন এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল, প্রাচীনকালে স্থাপত্য, শিল্প, জ্ঞানচর্চাকে যথেষ্ট উন্নত করেছিল। বুদ্ধদেব তো ভগবান মানতেন না। জৈন ধর্মের প্রবক্তা মহাবীরও তো ভগবান মানতেন না। এ দেশে তো বস্তুবাদী দর্শন ছিল, চার্বাক দর্শন ছিল, লোকায়ত দর্শন ছিল। বেদ-বেদান্তই একমাত্র দর্শন ছিল এ দেশে প্রাচীনকালে একথা বলা কি মিথ্যাচার নয়? ভারতের অন্যান্য প্রাচীন দর্শনের চর্চা তারা করবে না, কারণ সেগুলো তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের চাই অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস। তাহলেই পুঁজিবাদ নিশ্চিন্ত এবং সেটাই তারা করতে চাইছে। একথা আমাদের বুঝতে হবে।

আর একটা কথা অমি এখানে বলতে চাই। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনেক অপব্যাখ্যা এ দেশে হয়েছে। সেক্যুলারিজমের যে ব্যাখ্যা কংগ্রেস এতদিন করেছে তা হল, সমস্ত ধর্মকে সমান উৎসাহ দেওয়া। সমস্ত ধর্মকে উৎসাহ দেওয়ার নামে গান্ধিজির নেতৃত্বে হিন্দুধর্মকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তা না হলে পাকিস্তান হত না, দেশ ভাগ হত না। গান্ধিজি নিজে হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো চলতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। সেইজন্য 'নিচু জাত' বলে যারা পরিচিত, যদিও আমরা নিচু জাত বলে কাউকে মনে করি না, তারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতেই ছিল মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব। যথার্থ সেক্যুলারিজম বলতে কী বোঝায়? ইউরোপে বা ইতিহাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে যে সেক্যুলারিজমের ধারণা এসেছিল সেই সেক্যুলারিজম হচ্ছে রাষ্ট্র যেমন কোনও ধর্মকে উৎসাহ দেবে না, তেমন কোনও ধর্মকে বাধাও দেবে না। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে থাকবে। ইচ্ছা হলে কেউ মানবে, ইচ্ছা না হলে মানবে না। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, কেউ না-ও করতে পারে। আমাদের দেশে কংগ্রেস এটা করেনি। যথার্থ সেক্যুলারিজম হচ্ছে এটা। সুভাষচন্দ্রও বলেছিলেন, রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না, রাজনীতি চলবে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের বিষয় হওয়া উচিত, ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও

বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা।" (ক্রসরোডস) তিনি আরও বলেছিলেন, "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদেরকে ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ....এই বিশ্বাসঘাতকদেরকে আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না। আমরা চাই দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী নরনারী একপ্রাণ হয়ে দেশের সেবা করুক।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ মে, ১৯৪০) তিনি আরও বলেছিলেন, "... হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ... হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক — ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাউকে রেহাই দেয় না। " (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ মে, ১৯৪০) রবীন্দ্রনাথও রাজনীতিতে ধর্মকে আনার বিরুদ্ধতা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রও বলেছিলেন, "আদর্শের উল্লেখ যখন করব, তখনই বৃহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ, গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ করবো। কেবল মহামানবের আদর্শ গ্রহণ করবো, তাকে ভারতের আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার করবো না। কারণ সেইতো ক্ষুদ্রমনের সংকীর্ণ আদর্শ, কোনমতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়। ... বড় বড় ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের পলিটিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। যাদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তারা হলেন পলিটিসিয়ান। তাই ভারত পলিটিক্সে এতবড় দুর্গত।" (শরৎ রচনাবলী) এই সেক্যুলারিজমের চর্চা আমাদের দেশে হয়নি। সিপিএম-সিপিআইও যথার্থ সেক্যুলারিজমকে এ দেশের মানুষের কাছে নিয়ে আসেনি। না হলে তাদের দলের এই শোচনীয় অবস্থা হয়! সিপিএমের ভোটার, কর্মী-সমর্থকরা দলে দলে বিজেপিতে যাচ্ছে। কী বিপ্লব বুঝিয়েছে? কী বামপন্থা বুঝিয়েছে? তারা হিন্দু সিপিএম বুঝিয়েছে, মুসলিম সিপিএম বুঝিয়েছে। গত ভোটে হিন্দু সিপিএম চলে গেল বিজেপি'র দিকে, মুসলিম সিপিএম চলে গেল তৃণমূলের দিকে। এমন কমিউনিজম, এমন বামপন্থা, এমন সেক্যুলারিজম তারা বুঝিয়েছে! ভোটের জন্য শুধু সুবিধাবাদের চর্চা করে গেছে।

উন্নয়নের মিথ্যা বুলি

উন্নয়ন, উন্নয়ন একটা কথা চলে। যারাই ভোটে দাঁড়ায় উন্নয়নের কথাই বলে। এটা একটা লোকঠকানো স্লোগান। আর মানুষও তাদের কথায় ঠকে। একবারও প্রশ্ন করে না কার উন্নয়ন? সমাজ শ্রেণিবিভক্ত, পুঁজিপতি শ্রেণি-শ্রমিক শ্রেণি, শোষক-শোষিত, ধনী-গরিব এভাবে বিভক্ত, কার উন্নয়ন করবে তারা? শোষকদের উন্নয়ন, পুঁজিপতি শ্রেণির উন্নয়ন হয়, আর শ্রমিক-কৃষকের জীবনে চূড়ান্ত সঙ্কট নামে। উভয় শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। উভয়েরই উন্নয়ন একসাথে হতে পারে না। সিপিএমও উন্নয়নের কথা বলত, তৃণমূলও উন্নয়নের কথা বলছে,

বিজেপিও উন্নয়নের কথা বলছে এবং এভাবে মানুষকে ঠকাচ্ছে। আজকের বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র দেখুন। একদিন পুঁজিবাদই সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লবের যুগে জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুলেছিল। জাতীয় শিল্প চাই, জাতীয় বাজার চাই, জাতীয় অর্থনীতি চাই। সেদিন জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগতিশীল। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার স্লোগান উঠেছিল, জাতীয় শিল্প, স্বদেশি শিল্প চাই, স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ কর, বিলিতি দ্রব্য বর্জন কর, এই আওয়াজ সেদিন বুর্জোয়ারাই তুলেছিল। সেই সময় জাতীয় বুর্জোয়ারা ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু আজ সেই জাতীয় বুর্জোয়া একচেটিয়া পুঁজির স্তরে এসেছে, সেই জাতীয় বুর্জোয়া বিদেশে লগ্নি-পুঁজি পাঠাচ্ছে বিদেশের শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য, সেই জাতীয় বুর্জোয়ারাই মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে। নিজেরা বিদেশে যাচ্ছে বিদেশের বাজার লুণ্ঠন করার জন্য, আবার বিদেশী পুঁজির সাথে বোঝাপড়া করে নিজ দেশের বাজার লুণ্ঠন করার জন্য বিদেশি পুঁজিকে তারা আহ্বান করছে। দেশাত্মবোধ বলে আজ আর তাদের কিছু নেই। মাল্টিন্যাশনালদের কোন নেশনও নেই। গোটা বিশ্বই তাদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এমনকী মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিতে, অস্ত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজিকে ডাকছে। আরও বিদেশি পুঁজি এবং আধুনিক অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি তাদের দরকার। ভারতীয় পুঁজিবাদ অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হতে চাইছে। কারণ সে নিজে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী হয়েই নরেন্দ্র মোদি নেপালে গেলেন, শ্রীলঙ্কা যাবেন, মালয় যাবেন, বাংলাদেশে যাবেন। একদা আদবানি সাহেব জিন্নার প্রশংসা করেছিলেন বলে তাঁকে সভাপতির পদ থেকে রিজাইন করতে হয়েছিল আরএসএস-এর চাপে। অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদির শপথের দিনই কর্পোরেট সেক্টরের চাপে পাকিস্তানকে ডাকা হল। এসবের কারণ ভারতীয় পুঁজিপতিদের পাকিস্তানের বাজার চাই, নেপালের, বাংলাদেশের বাজার চাই, শ্রীলঙ্কার, মায়ানমারের বাজার চাই। ভারতীয় পুঁজি ও পণ্যের জন্য বাজার চাই। ভারতীয় পুঁজিপতিরা ইতিমধ্যেই ৩২ হাজার ৪২৬ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে বিনিয়োগ করেছে। আরবে, মধ্যপ্রাচ্যে, ল্যাটিন আমেরিকায়, এমনকী খোদ আমেরিকায়, ইউরোপে ভারতীয় পুঁজিপতিরা কলকারখানা চালাচ্ছে। মিত্তালকে আপনারা জানেন। বিশ্বের এক কি দুই নম্বর শিল্পপতি মিত্তাল। এই জায়গায় চলে গেছে ভারতীয় বুর্জোয়ারা। অন্য দেশের বাজারে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করার জন্য পুঁজির জোর যেমন চাই, তার সঙ্গে চাই অস্ত্রশক্তির জোর, যার চাপে ভীত থাকবে প্রতিবেশি শাসক শ্রেণি। এইজন্য তারা এইসব করছে। ফলে আজকের দিনে পুঁজিপতিদের জাতি বলে কিছু নেই, দেশ বলে কিছু নেই। তারা মানুষকে চেনে কিভাবে? মানুষকে চেনে তারা, মহান স্ট্যালিনের ভাষায় বলতে হলে, মানুষরূপী কাঁচামাল হিসাবে। কারখানার জন্য যেমন কয়লা চাই, মেশিনে কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি কারখানার জন্য শ্রমিক চাই, শ্রমিকের রক্ত মাংস শুষে নিয়ে কারখানা চলে, মালিক লাভ করে। ফলে মানুষকে শ্রমিক হিসাবেও লুঠ করে, খদ্দের

হিসাবেও লুঠ করে। শ্রম দেওয়ার জন্যই শুধু তাদের মানুষের প্রয়োজন.। দেশটা হচ্ছে নিছক শোষণক্ষেত্র। এছাড়া আর কোনও কিছু নয়। আজ পুঁজিবাদ এই জায়গায় চলে এসেছে। বিশ্বের প্রায় কোনও দেশেই পুঁজিবাদের পুরনো জাতীয় চরিত্র নেই। মাল্টিন্যাশনালের যুগে 'নেশন' ও সার্বভৌমত্বের ধারণাও বদলে গেছে। হ্যাঁ, নেশন-স্টেটকে সে ব্যবহার করে যদি বাজার নিয়ে লড়াই হয়। বাজার নিয়ে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে আবার জাতীয়তাবাদকে সে জাগাবে মানুষের মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য।

পুঁজিবাদী চরম শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে বিশ্বের আজ চেহারা কী? গোটা বিশ্বে সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ মিলে যে পরিমাণ সম্পদের মালিক, সমপরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত রয়েছে বিশ্বের মাত্র ৮৫ জন ধনী ব্যক্তির হাতে। দেখুন, কীভাবে সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে! গোটা বিশ্বে তিনশোকোটি লোকের দৈনিক আয় ১৫৫ টাকা। ১২০ কোটি লোকের দৈনিক আয় সাড়ে সাতাত্তর টাকা। চারশো কুড়ি কোটি লোকের এই হচ্ছে দৈনিক রোজগার। এই হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার। তাহলে পুঁজিবাদী বাজারের অবস্থা কী? এই সেদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি এ রাজ্যে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। তিনি বলেছেন, দেশের ১২১ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৬ কোটি বেকার। ৬৬ কোটি লোক যদি বেকার হয় তাহলে সে দেশের বাজারের অবস্থা কী? আমরা মনে করি এই সংখ্যাটা বাস্তবে ৮০ কোটিরও উপর, ভারতে ৮৫ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার তলায় বাস করে। গোটা বিশ্বে তীব্র বাজার সঙ্কট চলছে। যেমন জঙ্গলে বাঘ হরিণ খায়, আর হরিণের সঙ্গে সঙ্গে হরিণের গর্ভের সন্তানকেও খেয়ে ফেলে। ফলে জঙ্গলে আর হরিণ থাকে না, বাঘের খাদ্যে টান পড়ে। যারা তৃণভোজী তারা ঘাস খেতে খেতে শেকড় শুদ্ধ খেয়ে নেয়, ফলে আর ঘাসও থাকে না। পুঁজিবাদ হচ্ছে তাই। মানুষকে শোষণ করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, নিজের শোষণের বাজারকেও সে রক্ষা করতে পারে না। আজ গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের এই সঙ্কট — হাবুডুবু খাচ্ছে। ওরা বলে কোয়াসি পারমানেন্ট রিসেশন। মানে প্রায় স্থায়ী মন্দা। গোটা বিশ্বে আজ তাই চলছে। কখনও দু'শতাংশ উৎপাদন বাড়ল তো চার মাস বাদে তিন শতাংশ কমে যায়। এই হচ্ছে হাবুডুবু অবস্থা। সমস্ত রাষ্ট্রই চলছে ধারে। আমদের দেশে সরকারের শুধু বৈদেশিক ঋণই হচ্ছে ২৪১ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। এই বারের বাজেটে আর্থিক ঘাটতি হচ্ছে বাজেটে মোট আয়ের ৬২ ভাগ। ঋণ শোধ করতেই সব চলে যাচ্ছে। এর ফলে কী হবে? আরও জিনিসের দাম বাড়বে। আরও ট্যাক্স বাড়বে। দেদার নোট ছাপাবে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়বে। খাদ্যে, সারে ছিটেফোঁটা যতটুকু ভরতুকি আছে তা-ও তুলে নেবে। আর মাল্টিন্যাশনাল, কর্পোরেট সেক্টর, তারা লুণ্ঠন চালাবে। বেকারি, ক্লোজার, ছাঁটাই, স্থায়ীর পরিবর্তে ঠিকা মজুর নিয়োগ আরও বাড়বে, মজুরি কমবে। শ্রমিকদের অধিকারের ছিটেফোঁটা যাও আছে, দেশী বিদেশী পুঁজির অবাধ শোষণের স্বার্থে, তাও কেড়ে নেবে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদ থাকবে, অথচ ওরা

উন্নয়ন করবে! ওরা যার আরাধনা করে সেই 'ব্রহ্মা' এসেও কিছু করতে পারবে না। তারও সেই ক্ষমতা নেই।

পুঁজিবাদই আজ শিল্প ধ্বংস করছে

বহুদিন আগে মহান মার্কস বলেছেন, যে পুঁজিবাদ শিল্প-বিপ্লব এনেছিল, সেই পুঁজিবাদই শিল্পকে ধ্বংস করবে। এই পুঁজিবাদ মানবজাতির ভয়ঙ্কর শত্রু। ওদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির 'পার্লামেন্ট' আছে, 'ডেমোক্রেসি' বলে কিছু নেই। কোথাও নেই। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ওদেরই স্লোগান। কোথায় সেই সাম্য? একদিকে শোষক, আর এক দিকে শোষিত, চূড়ান্ত বৈষম্য, সাম্য কোথায়? মৈত্রী কোথায়? পুঁজিবাদই তো দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালাল। ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্থানকে আক্রমণ করে ধ্বংস করেছে, সিরিয়াকে ধ্বংস করছে, ইজরায়েল গাজাকে ছাই করে দিচ্ছে, প্যালেস্তাইনিদের হত্যা করছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ দেখে আপনারা শিউরে উঠছেন। কত লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশুকে হত্যা করেছে, কত হাজার হাজার গ্রাম-শহর পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুগে 'মৈত্রী'র স্বরূপ। সবই করেছে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝান্ডা উড়িয়ে। ওদের স্বাধীনতা হচ্ছে শোষক শ্রেণির অবাধ শোষণ-লুঠতরাজের স্বাধীনতা, আর জনগণকে নির্বিবাদে শৃঙ্খলিত করার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে বুর্জোয়াদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগানের আজকের পরিণতি! আজকের বুর্জোয়া নেতারা ভণ্ড, প্রতারক। এক সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে আমাদের নেতারা ছিলেন দেশের অভিভাবক। সুভাষচন্দ্রকে দেখে দেশের যুবকরা শিখত, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে দেখে শিখত। বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দকে দেখে যৌবন জাগত। আর এখনকার এই যে নেতারা, এদের দেখে দেশের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? এই পুঁজিবাদ মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, মূল্যবোধকে নষ্ট করছে। ধর্মচর্চা তো কম হচ্ছে না! কত মন্দির মসজিদ গির্জা! কত ধর্মীয় উৎসব, কত ধর্মীয় মেলা! কত গণতন্ত্রের জয়গান! একদিকে এই সব চলছে, তার সাথে প্রতিযোগিতায় চলছে মদ, ড্রাগের নেশা, জুয়া, সাট্টার নেশা, নারীদেহ নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য, ধর্ষণ। বৃদ্ধ লোক শিশুকে ধর্ষণ করছে, মায়ের বয়সী মহিলাকে ধর্ষণ করছে কিশোর, কোনও দিন কেউ দেখেছে, ভাবতে পেরেছে এই সব! এই তো ভারতবর্ষের উন্নয়ন, এই তো অগ্রগতি! এসব দেখলে অতীতের বড় মানুষরা চোখের জল ফেলতেন, তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়তেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন। অথচ আজ আমরা কি করছি? কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু দিন আগে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে, মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ কাজ করছে না, স্বদেশি আন্দোলনের মানবতাবাদী মূল্যবোধও কাজ করছে না। বিপ্লবী সর্বহারা মূল্যবোধ আজও ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছায়নি। ফলে একটা সর্বাত্মক শূন্যতা। মনুষ্যত্ব তো একটা আদর্শ-মূল্যবোধকে নিয়ে হবে। এক সময় ধর্ম মূল্যবোধ দিয়েছিল।

হাজার হাজার বছর আগে ধর্মকে ভিত্তি করে বড় চরিত্র এসেছিল। আবার মূল্যবোধ এসেছিল ইউরোপে নবজাগরণকে ভিত্তি করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে, আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনকে ভিত্তি করে। আবার মূল্যবোধ জেগেছিল রাশিয়াতে সর্বহারা বিপ্লবকে ভিত্তি করে, চীন ভিয়েতনামে সর্বহারা বিপ্লবকে ভিত্তি করে। আজ সেই মূল্যবোধ নেই।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর শূন্যতা। কোনও পরিবারে শান্তি নেই। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে শান্তি নেই। চরম অশান্তি, বিচ্ছেদ, তিক্ততা সর্বত্র গ্রাস করছে। বৃদ্ধ বাবা-মার দায়িত্ব সন্তান নেয় না, ঘর থেকে বের করে দেয়। এই সভ্যতাই তো গড়ে তুলেছে পুঁজিবাদ! মনুষ্যদেহী কিন্তু মনুষ্যত্বহীন মানুষ জন্ম দিচ্ছে পুঁজিবাদ। এটাই কি চলতে থাকবে? বেকারি বাড়বে, দারিদ্র বাড়বে, ছাঁটাই বাড়বে, অনাহারে মৃত্যু বাড়বে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়বে, নারী ধর্ষণ বাড়বে, মদ খাওয়া, জুয়া-সাট্টা খেলা বাড়বে, পারিবারিক জীবন ধ্বংস হবে। হয় এটা চলতে থাকুক, কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম তৃণমূলের রাজত্ব চলুক। আর না হলে এর পরিবর্তন চাই— যথার্থ পরিবর্তন চাই। যথার্থ পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেই পথ দেখিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সেই দল হচ্ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

হ্যাঁ সোভিয়েত ইউনিয়নে, চীনে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। সমাজতন্ত্রের এই ধ্বংস দেখলে সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল চোখের জল ফেলতেন, রমা রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনরা কাঁদতেন। এঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু এঁরা সকলেই সমাজতন্ত্রকে, মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পুঁজিবাদের অন্তিমলগ্নে ক্লেদাক্ত পরিণতি দেখে সমাজতন্ত্রকেই এঁরা একমাত্র আশার আলো হিসাবে দেখেছেন। এরাই ইতিহাসে মহান বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। আজকের দিনের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দেশীবিদেশী পুঁজির কাছে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেককে বিক্রি করে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মেতে উঠেছেন। ১৯৩০ সালে রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কি গভীর আবেগে বলেছেন, "একদিন ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু টিঁকলো না। এদের এখানকার (রাশিয়ার) বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের ওপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। ... জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী। ... হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনের বছর জিতবে বলে পণ করেছে। ... পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত। ... আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন

অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" (রাশিয়ার চিঠি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) নয় বছর বাদে ১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রুশ বিপ্লবের ভূয়সী প্রশংসা ও সাফল্য কামনা করে লিখেছেন, "...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব — এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ... নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যু শেল তোলবার সাধনা করছে, যেটাকে বলে লোভ। প্রার্থনা আপনি জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)

১৯৪৫ সালে সুভাষচন্দ্র যখন আই এন এ-র যুদ্ধে হারছেন, শেষ ভাষণে বলছেন, এখনও স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, এই স্ট্যালিন মানবজাতিকে পথ দেখাবেন। বিশ্বে কমিউনিজমের জয়যাত্রা সম্পর্কে কতটা আশা ব্যক্ত করে ১৯৩৯ সালে পুরুলিয়ার সম্বর্ধনা সভায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় অসংখ্য স্রোত ও প্রতিস্রোতকে দুটি প্রধান বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিপরীত স্রোতে ধাবমান কমিউনিজমের শক্তিগুলি, সেইজন্যই হিটলারবাদের অবসানের অর্থ কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা।" (ক্রস রোডস-সুভাষ চন্দ্র) সেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-শোধনবাদ ধ্বংস করেছে। এইরকম বিপদের আশঙ্কা করে গভীর উদ্বেগে মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁ 'আই উইল নট রেস্ট' (শিল্পীর নবজন্ম) পুস্তকে লিখেছিলেন, "রাশিয়া বিপন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে আজ পৃথিবীতে সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ... যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু পৃথিবীর সর্বহারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি ঘটিবে। ... যে কোন শত্রুর দ্বারাই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপন্ন হউক না কেন, আমি তাহার পাশে দাঁড়াইব। ... যদি রাশিয়া ধ্বংস হইয়া যায় ... বুঝিব কয়েক শতাব্দীর মত অন্ধকার গভীর হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।" বিংশ শতাব্দীর এই মহান মানবতাবাদী ও চিন্তানায়কের এই আশঙ্কা আজ মর্মান্তিক বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একদিন সকল শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষের সার্বিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছিল, পৃথিবীতে শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিল, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে শীর্ষস্থানে পরিণত হয়েছিল, আজ সেই দেশ ধ্বংসস্তুপে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের সর্বত্র মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা প্রায়সব লুপ্ত, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে গণতন্ত্র- স্বাধীনতা পদদলিত, ধর্মীয় মৌলবাদের করাল গ্রাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন, শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল অধিকার লুণ্ঠিত এবং কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ ও ধর্ষিতা-অপমানিতা নারীর আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। অবশ্য এর জন্য হতাশ হওয়ার

কারণ নেই। আমরা দুঃখিত, কিন্তু হতাশ নই। কারণ ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি, কোনও মহৎ আন্দোলন একবারে জয়লাভ করতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্মকে জয়লাভ করার জন্য শত শত বছর লড়াই করতে হয়েছে, বারবার হারতে হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান, কিন্তু তাঁদেরও শত শত বছর লড়াই করতে হয়েছে, হার-জিতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে চূড়ান্ত জয়ের জন্য সাড়ে তিনশো বছর ধরে লড়াই করতে হয়েছে। আমাদের দেশেও তো স্বদেশি আন্দোলন বহু দিন ধরে চলেছে। ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শোষণ উচ্ছেদের লড়াই ছিল না, এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে অন্য ধরনের শোষণ এনেছে। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নেই পৃথিবীতে প্রথম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্র মাত্র সত্তর বছর ছিল। দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ— কয়েক হাজার বছরের শোষণমূলক ব্যবস্থা, — এই কয়েক হাজার বছরের শোষণের ইতিহাসের বিরুদ্ধে সত্তর বছর কতটুকু! তাকে ধ্বংস করেছে বাইরের শত্রু, ভেতরের শত্রু। সমাজতন্ত্র কেন ধ্বংস হল, সেই শিক্ষা নিয়ে আবার আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। মার্কসবাদ মার্কস চেয়েছেন বলে আসেনি। যেমন ধর্মপ্রচারকরা, বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তাঁদের ইচ্ছার জোরে আসেননি। প্রত্যেক আদর্শ জন্ম নেয় ইতিহাসের প্রয়োজনে, অমোঘ নিয়মে। মার্কসবাদও ইতিহাসের প্রয়োজনেই এসেছে। পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রমিক বিপ্লবের আকুতি নিয়ে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মার্কসবাদের জন্ম। মার্কসবাদই একমাত্র দর্শন, যে দর্শন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই সত্য হিসাবে গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি প্রকৃতি জগতের এক এক ক্ষেত্রে কাজ করে। এক এক ক্ষেত্রে এক একটা গভর্নিং ল (নিয়ন্ত্রক নিয়ম) আবিষ্কার করে। মহান মার্কস এই সব বিশেষ নিয়মগুলিকে দ্বান্দিক পদ্ধতিতে সংযোজিত (কোঅর্ডিনেট), সম্পর্কিত (কোরিলেট) করে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, যে নিয়মগুলি সর্বজনীন হিসাবে, একটা সিস্টেম অফ ডিসিপ্লিন হিসাবে প্রকৃতিজগত ও সমাজ জীবনের সকল গতি ও পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের পরিবর্তনের নিয়মও তিনিই আবিষ্কার করেছেন। পুঁজিপতিরা শিল্পের প্রয়োজনে, কৃষির প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে, সৌরজগৎ অভিযান করতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে, যানবাহন নির্মাণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগায়, যেখানে তাদের প্রয়োজন সেখানেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগায়। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে নেওয়ায় ওদের ঘোরতর আপত্তি, সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে নিতে প্রবল বিরুদ্ধতা, আদর্শ ও ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে, সমাজের সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে নিতে প্রচন্ড বাধা, এইসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চলবে না। কারণ তা হলে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়। আমরা বলি এহসব ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানকে নিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে। যে নিয়মে আদিম সমাজ থেকে দাসপ্রথা, দাসপ্রথা থেকে

রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ এসেছে, সেই একই নিয়মে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র, তারপর সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদ আসবে। এটাই ইতিহাসের নিয়ম। এটাই মার্কসবাদের শিক্ষা। এইভাবেই কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং এর ভিত্তিতেই এই দলটা তিনি গড়ে তুলেছেন।

সিপিআই, সিপিএম কোনও সময়ই মার্কসবাদ অনুসরণ করেনি

তিনি দেখেছেন, নবজাগরণের যুগের মনীষীদের স্বপ্ন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সফল হয়নি। সেই স্বাধীনতা এ দেশে আসেনি। যথার্থ স্বাধীনতা চাই, যথার্থ স্বাধীনতা মানেই হল শোষণমুক্ত সমাজ। এই শোষণমুক্ত সমাজ তৈরির প্রয়োজনেই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) তিনি গড়ে তোলেন, যেহেতু এ দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি বলে যে পার্টি ছিল, যার থেকে সিপিএম এসেছে, সেই পার্টি কোনও দিনই কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এর ইতিহাস কী? আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করছে, আর ক্ষুদ্র বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়ারা বিপ্লবী, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, কমিউনিস্টদের উচিত এই পেটিবুর্জোয়াদের সাথে ঐক্য করে আপসকামী বুর্জোয়াদের স্বদেশি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। অথচ এই তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি যখন গান্ধিবাদীরা আপসহীন যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রকে কোণঠাসা করে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করছে, শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করছে, তখন তারা গান্ধিবাদীদের পক্ষে দাঁড়াল, সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করল না। এই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস। তা না হলে স্বদেশি আন্দোলনের চেহারাটাই পাল্টে যেত। চীনে মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ সুভাষচন্দ্রের মতো আর একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন-এর সাথে ঐক্য করে চীনে বিপ্লব সফল করার জমি প্রস্তুত করেছিলেন। এখানে সুভাষচন্দ্রকেও সেভাবে পাওয়া যেত। সুভাষচন্দ্র নিজেই সেটা চেয়েছিলেন। রামগড় কনফারেন্সের প্রস্তুতির সময়ে তিনি বলেছেন, "কংগ্রেসের ভেতরে যে সমস্ত প্রগতিশীল, র‍্যাডিক্যাল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি এখনই সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করতে প্রস্তুত নয়, তাদের নিয়ে একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। আমি আরও বুঝেছিলাম, একমাত্র এইভাবেই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ ঠেকানো যেত এবং একটা মার্কসবাদী দল গড়ে ওঠার জমি প্রস্তুত করা যেত।" (রামগড় কংগ্রেসে ভাষণ-সুভাষচন্দ্র) ওরা সেই কনফারেন্সে যায়নি, ওরা তখন গান্ধিবাদীদের সাথে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত ছিল। এসব কার্যকলাপ দেকে সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, "কমিউনিজমের বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ভারতে

কমিউনিজম বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি প্রধানত এই কারণে যে, তার প্রধান সমর্থকেরা যেসব পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন, তাতে মানুষকে আকর্ষণ করে বন্ধু এবং সহযোগী বানানোর চেয়ে বরং শত্রু ভাবাপন্ন করে তোলে।" (ক্রস রোডস- সুভাষচন্দ্র) এই কমিউনিস্ট পার্টি বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে নামেনি। গোটা দেশ জুড়ে যখন লড়াই চলছে, এই কমিউনিস্ট পার্টি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। মহান স্ট্যালিন সেই জন্য তাদের তীব্র তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তোমরা সাম্রাজ্যবাদের দালালি করলে? এই ছিল তাদের ভূমিকা। সুভাষচন্দ্র আই এন এ বাহিনী গঠন করেছিলেন। জাপানের সাথে তাঁদের ঐক্য ছিল কৌশলগত। এই কৌশল ঠিক ছিল কি বেঠিক ছিল সেটা বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সিপিআই নেতারা নেহেরুর সাথে গলা মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রকে বললেন, জাপানের দালাল। এই হচ্ছে ওদের ইতিহাস।

তারপর তাঁরা বললেন, হিন্দু একটা জাতি, মুসলমান একটা জাতি। আর এস এস নেতারা শুনলে অবশ্য খুশি হবেন। এই ব্যাখ্যা ছিল তদানীন্তন সিপিআইয়ের। এই যুক্তিতে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করেছিল তারা। এই হচ্ছে তাদের অতীত। কতবার সুযোগ নষ্ট করেছে তারা, যেহেতু যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না। আজও সিপিআই-সিপিএমের তত্ত্ব কী? তাঁদের তত্ত্ব হচ্ছে, ভারতে বুর্জোয়ারা প্রগতিশীল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করবে তারা। ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝাতে সিপিএম বলছে, বুর্জোয়া-ল্যান্ডলর্ড স্টেট — হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়াজি। এই বিগ বুর্জোয়াজি কারা? ওরাই তো একচেটিয়া পুঁজিপতি। ভারতে একচেটিয়া পুঁজি এসেছে,তা সি পি এম স্বীকার করে। লেনিন বলছেন, একচেটিয়া পুঁজি হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তর, ফাইনাল স্টেজ, এই স্তরে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে। সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অর্থাৎ সি পি এমের ভাষায় বিগ বুর্জোয়াজি ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। অথচ সিপিএম বলছে, তাদর 'বিপ্লব' সামন্ততন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের মিত্র। আর এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সিপিআই একসময়, পরবর্তীতে সিপিএমও, ইন্দিরা গান্ধি প্রগতিশীল, মোরারজি প্রতিক্রিয়াশীল বলেছিল। ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা, সেই সময়ের বিশ দফা কর্মসূচিকে কার্যত এরা সমর্থন করেছিল। এরা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরা সরকার বিরোধী আন্দোলনে নামেনি। সিপিআই খোলাখুলি সমর্থন করেছিল ইন্দিরা গান্ধিকে, সিপিএম তলে তলে সমর্থন করেছিল। যার সুযোগ নিয়ে জনসংঘ শক্তি বাড়াতে পারল। বিজেপি আজ এই জায়গায় আসতেই পারত না ওরা সেহসময় আন্দোলনে নামলে। আমরা একা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের শক্তি ছিল কম। এগুলো অতীত। আবার এই সিপিএম নেতারাই যে জনতা পার্টির মধ্যে আর এস এস ছিল, জনসংঘ ছিল, তার সাথে ঐক্য করেছিল ১৯৭৭ সালে ভোটের স্বার্থে, এ কথাও জেনে রাখুন। এই জনতা পার্টির ব্যাকিংয়ে এরা এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে। সে-

সময় জনতা পার্টির মধ্যে জনসংঘ ছিল, আর এস এস ছিল। এই সিপিএম বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে সমর্থন করেছিল ভি পি সিং-এর সরকারকে। এই ময়দানে জ্যোতিবাবু বাজপেয়ী একসঙ্গে মিটিং করেছেন। এই কলকাতা কর্পোরেশন সিপিএম চালিয়েছিল বিজেপির সমর্থনে। এগুলি হচ্ছে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ।

মাথা উঁচু করে চলার পথ দেখিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

এই পার্টিকে কমরেড শিবদাস ঘোষ চিনেছিলেন জেলে থাকাকালীন। আগস্ট আন্দোলনে তিনি বন্দি ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মহান মার্কসবাদকে ভিত্তি করে, পার্টি গঠনের সঠিক লেনিনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে এই পার্টি গড়ে ওঠেনি। ওদের নেতারা সৎ হতে পারেন, কিন্তু মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেননি। এদেশে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ তাঁরা করেননি। তিনি মার্কসবাদের শিক্ষানুযায়ী বুঝেছিলেন, একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল অধঃপতিত হতে হতে সংশোধনবাদের পথে বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু নামে মার্কসবাদী, বাস্তবে পেটি বুর্জোয়া বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলকে সংশোধন করে যথার্থ মার্কসবাদী করা যায় না। ফলে তিনি বুঝেছিলেন, যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল চাই। ছ'জন সঙ্গী নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে সেদিন কেউ চিনত না, দলের কোনও অফিস ছিল না, থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়াও জুটত না। এই কলকাতা শহরে পার্কে পার্কে কাটিয়েছেন, নানা স্টেশনে কাটিয়েছেন। কতদিন অনাহারে-অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। আমি আমার স্কুল জীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষকে না খেয়ে থাকতে দেখেছি। আজ আমাদের জন্য অনেক আয়োজন হয়। দল এখন অনেক বড়। কিন্তু আমরা এক মুহূর্তের জন্যও সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারি না। তখন সিপিআই কত বড়। আর এস পি অনুশীলন সমিতির থেকে গড়ে উঠেছিল, বিরাট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, নেতাজির হাতে গড়া বিরাট পার্টি। আমাদের পার্টিকে ওরা ব্যঙ্গ করে বলত 'চামচিকেও পাখি, এস ইউ সি-ও পার্টি', বলত, 'পার্টি নয়, ওটা একটা ক্লাব।' কমরেড শিবদাস ঘোষ কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁকে কেউ কেউ বলত, আপনার বক্তব্য ঠিক, কিন্তু আপনি পারবেন না। আপনার লোকজন নেই, আপনার কোনও প্রেস-পাবলিসিটি নেই, আপনার টাকা নেই— এভাবে বৃথা চেষ্টা করে আপনার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, আমি মরতে মরতেও লড়ব, লড়তে লড়তেই মরব, আমার আদর্শের মধ্যে যদি সত্য থাকে, ইতিহাস একদিন তার মূল্য দেবে, আমি হয়ত গাছতলায় মরব, কিন্তু বিপ্লবের জন্য একটা ইট হলেও গেঁথে দিয়ে যাব। আজ আমাদের দল যথেষ্ট বড় হয়েছে, প্রায় সব রাজ্যেই বিস্তার ঘটেছে এবং তা এম এল এ, এম পি-র জোরে নয়। আমাদের দল কি ভাঙছে? গতবার আমাদের দলের একজন এম পি ছিল, যদিও আমাদের একার শক্তিতে নয়, গতবার তৃণমূলের সাথে আমাদের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের

আন্দোলনকে ভিত্তি করে ঐক্য ছিল। এবার আমরা একার শক্তিতে লড়েছি। জানতাম, জেতার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। চেষ্টা করেছি, এই পর্যন্ত। সাধারণ পাবলিকের খুবই সাপোর্ট ছিল। কিন্তু আমরা মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার এবং রিগিং মেশিনারিকে পরাস্ত করতে পারিনি। কিন্তু তার জন্য একজন কর্মীও কি আমাদের দল ত্যাগ করেছে? একজন সদস্যও কি দল ত্যাগ করেছে? বরং আমাদের শক্তি বেড়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এই দলের কর্মীরা বিপ্লবী আদর্শে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নির্বাচনেও আমরা নতুন নতুন মানুষ পেয়েছি। সিপিএম থেকে পেয়েছি, অন্য দল থেকে পেয়েছি, সাধারণ মানুষ থেকে পেয়েছি। আমরা রাস্তায় রাস্তায় কুপন বিক্রি করে, ঘর ঘর থেকে চাঁদা তুলে দল চালাই। আমাদের দলের কয়েক হাজার কর্মী আছে, যারা চাকরি করে না, সাধারণ জীবন যাপন করে না, যারা পার্টির জন্য সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। গোটা ভারতবর্ষে একটা নতুন সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে উঠছে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, অতীতের বড় মানুষদের সম্মান কর, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নাও, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনে প্রয়োগ কর। তিনি আমাদের বলেছেন, বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান। বলেছেন, চরিত্রই হচ্ছে আসল, বড় বড় কথা নয়, বড় বড় কোটেশন আওড়ানো নয়, মনুষ্যত্ব চাই, চরিত্র চাই। মানুষকে জয় কর আচার-ব্যবহার দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সুশালীন আচরণ দিয়ে, মিথ্যা দিয়ে কখনও বড় কাজ হয় না। তিনি শিখিয়েছেন, মানুষ মাত্রই একদিন না একদিন মারা যাবে। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, মৃত্যুর সময়ও মাথা উঁচু করে মরবে— বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে এই মন নিয়েই চলবে। কোথাও অন্যায়ের কাছে, মিথ্যার কাছে মাথা নিচু কর না। জীবনে যেখানে যত অন্যায় দেখেছি, মানুষ হিসাবে আমি তার প্রতিবাদ করেছি, মানুষ হিসাবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের বেঁচে থাকার আনন্দ। মনে রাখতে হবে, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত এগুলি নিয়ে কেউ কোনও দিন বড় হয়নি, দুনিয়ার যারাই বড় মানুষ, তাঁরা কত সম্পত্তির মালিক, কার ব্যাঙ্কে কী আছে এই দিয়ে বিচার হয়না। তাঁরা অনেকেই অনাহারে গাছতলায় কাটিয়েছেন, অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু মনুষ্যত্বের জোরেই তাঁরা বেঁচে আছেন যুগ যুগ ধরে — এই কথাই তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। আমাদের দলের হাজার হাজার কর্মী এই শিক্ষাতেই অনুপ্রাণিত। এইভাবে আমরা গোটা দেশব্যাপী এবং এ রাজ্যে শ্রমিকেদের দাবিতে কলে-কারখানায় সংগ্রাম সংগঠিত করছি। আমরা গ্রামীণ গরিব কৃষক-খেতমজুরদের দাবি নিয়ে, গ্রামীণ মজুরদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছি। আমরা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা ছাত্রদের শিক্ষার দাবিতে লড়াই করছি। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবিতে লড়াই করছি। আগামী দিনেও লড়ব রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু লড়াইয়ের মূল

লক্ষ্য কী? মূল লক্ষ্য হচ্ছে, শুধু দাবি আদায়ই নয়, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় দীক্ষিত করা, মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় সুশিক্ষিত করা, মানুষকে লড়তে শেখানো, মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরতে শেখানো, মানুষকে আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে শেখানো। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চাই, চাই গণকমিটি। পাবলিক কমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী এলাকায় এলাকায় মহল্লায় মহল্লায় গড়ে তুলুন।

আজকের সভায় এই যে বিশাল জনসমুদ্র যেন, দূরে চৌরঙ্গী পর্যন্ত চলে গেছে, সবাই তো আমাদের দলের লোক নয়। সকলকে আমরা বলছি, অনেকবার মার খেয়েছেন। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি কার কথামতো চলে, কে চালায়? মালিকরা চালায়, পুঁজিপতিশ্রেণি চালায়। ইলেকশনে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে, কে দেয়? এই মালিকশ্রেণি দেয়। এদের দ্বারা বারবার বিভ্রান্ত হয়ে আপনারা ঠকেছেন, আবারও ঠকবেন? আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন। রাজনীতি বুঝুন। 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব'— এ কথা ভেবে রাজনীতি থেকে মুখ ঘোরাবেন না। নাহলে আবারও দুষ্ট রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি রাজত্ব করে যাবে এবং দেশের সর্বনাশ আরও বাড়বে। মাথা দিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে দল বিচার করুন, সঠিক নেতৃত্বে চলুন। লোকের ভীড় দেখে বড় দল বিচার করবেন না, বিচার করবেন নীতি-আদর্শ-চরিত্র বড় কি না। অন্ধের মত বড় দলের পেছনে ছুটে বারবার মার খেয়েছেন। ফলে সত্যিকারের দল বুঝুন, নীতি-আদর্শ বুঝুন, চরিত্রের সাধনা করুন। ছাত্র যুবকদের বাঁচান, ছাত্র-যুবকদের চরম সর্বনাশ করা হচ্ছে। এ বাংলা একদিন ক্ষুদিরামকে জন্ম দিয়েছিল, এ বাংলা একদিন প্রীতিলতাকে জন্ম দিয়েছিল, বাঘা যতীনকে জন্ম দিয়েছিল, এই বাংলা রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলকে জন্ম দিয়েছিল, সুভাষচন্দ্রকে জন্ম দিয়েছিল, সেই বাংলার অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া যাবে? সিপিএম এবং তারপর তৃণমূল এসে এই বাংলার কী চেহারা দাঁড় করিয়েছে! বাংলার মানুষ এই দলগুলিকে মেনে নেবে? এ জন্যই বলছি, আপনারা ছাত্র-যুবকদের জাগান, দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। শিক্ষকদের বলছি চাকরির লোভে, প্রমোশনের লোভে কোনও দলের কাছে মাথা নিচু করবেন না। আপনারা তো না খেয়ে মরবেন না। এই যে কলেজের অধ্যক্ষ, ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর সিপিএমের পেছন পেছন হেঁটেছেন, এখন তৃণমূলের পেছনে হাঁটছেন, এটা কি সম্মানজনক জীবন? শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা যারা সরকারি খেতাবের লোভে নিজেদের বিবেক বিক্রি করছেন, তারা কি ঠিক করছেন? আপনারা সমাজে কেন, নিজের পরিবারেও কি যথার্থ মানুষ হিসাবে সম্মান পাবেন? অর্থ ও পদের লোভই কি বড় আপনাদের জীবনে? বংশধরদের জন্য কি আদর্শ রেখে যাবেন? আমি পুলিশ কর্মীদেরও বলব, আপনারা সিপিএমের হয়ে কাজ করেছেন, এখন তৃণমূলের জন্য কাজ করছেন প্রমোশনের লোভে, খারাপ জায়গায় ট্রান্সফার করে দেওয়ার ভয়ে। আপনারা মানুষের ঘৃণা কুড়োচ্ছেন। আপনাদের ঘরের

ছেলেমেয়েরা কী শিখবে আপনাদের থেকে? এমনিতেই দেশের আইন জনগণের জন্য নয়, বুর্জোয়া শ্রেণির জন্যই করা হয়। অথচ শিল্পপতিরা-শাসক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা নিজেদের স্বার্থে সেই আইন ভাঙলেও তো আপনারা আইন রক্ষা করতে পারছেন না। আইন কি আইনের পথে চলছে? আইনকে ওরা যে পথে চালায়, সে পথে চলে। আপনাদের কীভাবে ব্যবহার করছে? ওরা মন্ত্রীত্ব করছে, রাজা-উজির হচ্ছে, গাড়ি হাঁকিয়ে চলছে, আর আপনাদের দিয়ে হীন কাজগুলো করাচ্ছে। আর আপনারা সাধারণ মানুষের ঘৃণা কুড়োচ্ছেন। এসব কথা আপনারা ভাবুন। জনগণকে আবার বলব, গ্রামে-শহরে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। ১১ আগস্ট আসছে, শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি দিবস। বাংলায় ঘরে ঘরে পালন করুন। এরপরে আসছে সেপ্টেম্বর মাসে দুইজন মনীষী — ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। এইসব দিনগুলি উদযাপন করুন। এদের কথা ঘরে ঘরে নিয়ে যান।

সভ্যতার প্রয়োজনেই শিশুদের বাঁচান

আর একটি কথা আপনাদের সকলকে আমি বলব। আমাদের দলের কর্মীদের আমি বারবার বলছি, নাগরিক হিসাবে আপনাদেরও আমি বলব — আপনারা প্রত্যেকে পাড়ায় ছুটির দিনে অন্তত সকালবেলায় বাচ্চাদের খেলাধূলা করান, বাচ্চাদের আবৃত্তি, বিতর্ক করান। বাচ্চাদের কাছে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যান, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্রদের নিয়ে যান। এই বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্লু-ফিল্মের প্রভাবে, মোবাইলের প্রভাবে, সিনেমার নোংরা ছবির প্রভাবে আপনার ঘরের বাচ্চাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের বাঁচান, তারা আমাদের দল না করুক। সভ্যতার প্রয়োজনেই এই কাজ করুন।

মানবসভ্যতার মুক্তির প্রয়োজনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করুন

সভ্যতা মুক্তির আকাঙ্খায় ব্যাকুল। একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই মুক্তির পথ দেখাতে পারে। সমগ্র বিশ্বের মানবসভ্যতা আজ বিপন্ন। এতবড় সঙ্কটের সামনে মানবসভ্যতা আগে আসেনি। মানবসভ্যতা কাঁদছে, ব্যথা-বেদনায় ছটফট করছে, মানব সভ্যতা মুক্তি চাইছে। মুক্তি একমাত্র অর্জন সম্ভব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রদর্শিত পথে। এই বৈপ্লবিক চিন্তাকে গ্রহণ করে এস ইউ সি আই (সি) দলকে শক্তিশালী করুন। এই দলের শক্তি যত বাড়বে, তত বিপ্লবী আন্দোলন, গণআন্দোলন এগোবে। এই দলকে শক্তিশালী করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমি আজ এখানে শেষ করছি।